# বেলা ফুরাবার আগে

[বাংলা– Bengali – بنغالي ]

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব

2015-1436

IslamHouse.com

# ﴿قبل انتهاء رحلة الحياة﴾

« باللغة البنغالية »

أبو بكر سراجي

مراجعة: علي حسن طيب

2015 - 1436

IslamHouse.com

# বেলা ফুরাবার আগে

**কেন এই প্রয়াস?**

□ সমাজচিন্তকদের সমাজের চিত্র উন্মোচন করার জন্য।

□ যে যুবক ও তরুণশ্রেণি দেশের ভবিষ্যত- সেই যুবকশ্রেণির চারিত্রিক অধঃপতনে রোধে করণীয় স্থির করার জন্য।

□ যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেই সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

□ গর্তে পতিত হওয়া মুমিনের কাজ নয়। সমাজ ধ্বংসের গর্তগুলো চিহ্নিত করে গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য।

□ ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে চলমান অঘোষিত যুদ্ধে আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সামান্য প্রয়াস হিসেবে।

আপনি নিজে ভালো হলেও সমাজকে
ভালো করার জন্য বইটি পড়ুন।

## সূচিপত্র

## আলেম কমানোর ঘোষণা এবং একজন নায়িকার উপলব্ধি

বিজ্ঞানময় আবিস্কার মানবজাতিকে যেসব নিত্যসৃষ্টে বাধিত ও ব্যাকুল করেছে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিনোদন সংস্কার। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার হাত ধরাধরি করে সিনেমা-থিয়েটার মানুষের বিনোদন জগতকে মাতিয়ে রেখেছে উন্মাতাল আবেগপ্রবণতায়। বাস্তবজীবনে ব্যর্থ কিংবা হতাশাক্লিষ্ট দর্শক সিনেমা-থিয়েটারে খুঁজে পায় শিহরিত বিনোদন ও উত্তেজক আনন্দ। কারণ বাস্তবজীবনে যা আদৌ সম্ভব নয় তাই দেখানো হয় এসব জায়গায়। একমাত্র সিনেমা-থিয়েটার আর নাটক-নোবেলেই সম্ভব অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। কারণ এখানে সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই।

এখানে দৃশ্যত নারী-পুরুষদের কোনো অসম্ভব আচরণ বা অস্বাভাবিক উক্তি করা ও কিছু করে দেখানোতে বাধা নেই। তাই বাস্তব জীবনে যা একেবারেই অসম্ভব কিংবা কল্পনাতেও যা আসে না, নাটক-সিনেমায় সেগুলো দেখে দর্শকরা ‘ওয়াও’ আর ‘এঙ্কোর এঙ্কোর’ বলে চেঁচিয়ে ওঠে! দর্শকরা জানে না, সিনেমায় যে প্রণয়নিবেদন কিংবা অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রদর্শিত হয় অথবা ভিলেন কর্তৃক মায়ের কাছ থেকে সন্তান কেড়ে নেয়ার যে উত্তেজক দৃশ্য দেখে তারা ব্যথিত হয় তার ষোলো আনাই মিছে, ষোলো আনাই স্টেজ-ম্যানেজড্! ষোলো আনাই ফান ও ফাঁকি! কিন্তু হতভাগ্য দর্শকের এসব জানার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বর্হিদেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে গল্পের বাস্তবতা চিরকাল থাকে লোকলোচনের অন্তরালে। তাই নাটকের যেখানে শেষ জীবনের সেখানেই শুরু!

কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। রচিত কাব্য ও কল্পিত নাটকই কখনও কখনও মানুষের জীবনে চরম সত্য হয়ে ধরা দেয়। সেই সত্য গল্প কাহিনীর গল্পের চেয়েও নির্মম, অভিনীত নাটকের চেয়েও অবিশ্বাস্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে! সেই অবিশ্বাস্য একটা গল্পই আজ আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রেক্ষাগৃহের উত্তাপ কখনও কখনও বাইরেও আঘাত হানে। শ্রুতিগর্জন করে এই জগতের বাইরের লোকদের কানেও। চেপে ধরার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যের ঘাম নাকে প্রবিষ্ট হওয়ার মতো কানে পড়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্য। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ‘সুদের ধোঁয়া সব মানুষকে আচ্ছন্ন করা’র মতোই।

কল্পনার জগতকে কেন্দ্র করে বাস্তবজীবন রচিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ কেউই প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত কোনো অভিনয় কিংবা অবাস্তব জীবনের মহড়া বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করে না কিংবা সে অনুযায়ী সংসারও পাতে না। তাই প্রযোজকরা বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করেই অবাস্তব ঘটনার অবতারণা ঘটান। সেই অবাস্তব অবতারণায় একজন পুরুষের (নায়কের) পাশে সার্বক্ষণিক থেকে ছবিকে রঙে-ঢঙে ফুটিয়ে তুলতে একজন নায়িকার প্রয়োজন হয়।

নব্বই দশকে ‘সোহরাব-রুস্তম’ নামের একটা ছবি নাকি খুব আলোড়ন তুলেছিল। আর সেই ছবিতে ইলিয়াস কাঞ্চনের পাশে একজন নায়িকা ছিলেন। নাম তার বনশ্রী (মূল নাম শাহিনা আখতার)। মুক্তি-পরবর্তী ছবিটি ব্যাপক ব্যবসা সফলও হয়েছিল। অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একটা সরল মেয়ে এই ছবির নায়িকা

বনশ্রীও রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন। তাই দামি গাড়িতে ভ্রমণ, বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেই কেটেছে বনশ্রীর সেই তারকাখ্যাতির দিনগুলো। বললে বিশ্বাস হবে! সেই তারকা নায়িকা বনশ্রী আজ ঢাকার রাজপথের ফুটপাতে হেঁটে হেঁটে এবং বাসযাত্রীদের কাছে নামাজ শিক্ষার বই বিক্রি করেই দিন যাপন করছেন!

একসময়ের বিতর্কিত প্রযোজক ফারুক ঠাকুর এই বনশ্রীকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন 'সোহরাব-রুস্তম' ছবিটি। তখন বনশ্রী ফারুক ঠাকুরের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন বলেও গুঞ্জন ছিল। অথচ বনশ্রী ছিলেন অন্যজনের ঘরণী। তিনি শ্যামল দাস নামের এক হিন্দু স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তেন। সেই স্যার বনশ্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বনশ্রীর পরিবার থেকে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে স্বধর্ম ত্যাগ করে তিনি বনশ্রীকে বিয়ে করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে মোহ কেটে যায়। যিনি তাকে বিয়ে করার জন্য গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই তিনিই তাকে ছাড়ার ফন্দি করতে থাকেন।

এরপর বনশ্রী নেমেছিলেন শোবিজের কণ্টকাকীর্ণ পথে। যার মাধ্যমে সিনেমা জগতে এসেছিলেন তাকে কড়া শর্ত দিয়েছিলেন পার্শ্বনায়িকা নয়- মূল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। শুধু তাই নয়, যেনতেন নায়কের সঙ্গে অভিনয় নয়, তখনকার যিনি হিট তার সঙ্গে অভিনয় করবেন। না জানি কী এক জাদু ছিল বনশ্রীর কথায়, আচরণে কিংবা সৌন্দর্যে। যার ফলে সিনেমা জগতের জন্য এই

অবাস্তব শর্তও তৎকালীন পরিচালক ফারুক ঠাকুর সহজেই মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রথমদিন থেকেই চেয়েছিলেন বনশ্রীকে এদেশের প্রথম সারির একজন নায়িকা বানাবার। এজন্য তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ, অপরিচিত ও গ্রাম্য মেয়েটির জন্য ছবিতে বিনিয়োগও করেছিলেন প্রচুর। এরপর ঘটেছিল অনেক কিছু। কিন্তু যেহেতু বনশ্রী আজ ঘরে ফেরার পথে আছেন, নিজ সন্তানকে গড়ে তুলতে চাচ্ছেন একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাই সেই অবাঞ্ছিত ইতিহাস উল্লেখ না করাই ভালো।

পত্রিকার খবর, সোহরাব-রুস্তমের পর বনশ্রী অভিনীত 'নিষ্ঠুর দুনিয়া' ও 'ভাগ্যের পরিহাস' নামের দুটি ছবির কাজও শুরু হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ছবি ও নাটকের কল্পিত ঘটনা ও আখ্যানই কখনও কখনও মানুষের বাস্তবজীবনের আঙিনায় তীব্রবেগে আছড়ে পড়ে। বনশ্রীর বেলায়ও তাই ঘটল। ছবির সেই কল্পিত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বনশ্রীর বাস্তবজীবনে আঘাত হানল। সেই আঘাতে জর্জরিত ঘরছাড়া, অর্থহারা, সন্তানহারা বনশ্রী আজ তিন বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে হকারি করে দিনযাপন করছেন! কিছুদিন আগে খবর বেরুলো, শাহবাগে তিনি ফুল বিক্রি করছেন!

ঘটনার সারাংশ হচ্ছে, ফারুক ঠাকুর নিজ বলয়ের বাইরে কারও ছবিতে কাজ করতে দিতেন না বনশ্রীকে। এ নিয়ে বনশ্রীর মনে ক্ষোভ থাকলেও ফারুক ঠাকুরের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। বনশ্রী থাকতেন মোহাম্মদপুরের একটি আলিশান বাড়িতে। বিলাসিতারও কোনো কমতি ছিল না। এত সুখ হয়তো তার কপালে

সয়নি। একটি দুর্ঘটনা সবকিছু বদলে দেয়। গুলশান এলাকার একটি জমি নিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে ফারুক ঠাকুরের বিরোধ ছিল। একদিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার একপর্যায়ে ফারুক ঠাকুরের ছোঁড়া গুলিতে প্রতিপক্ষের এক লোক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনার পর ফারুক ঠাকুর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি আর প্রকাশ্যে আসেননি। একা হয়ে যায় বনশ্রী। ফারুক ঠাকুর তাকে ঢাকার নামীদামী এলাকায় একটি বাড়িও করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বনশ্রীর বাবা তাতে অনীহা প্রকাশ করায় তা আর করা হয়নি। ফলে বনশ্রীর জীবনযুদ্ধ আরো কঠিন হয়ে ওঠে।

তারপর থেকেই শুরু হয় বনশ্রীর জীবনযুদ্ধ। ফারুক ঠাকুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনশ্রীকে নিয়ে আর কেউ ছবি বানাতে আগ্রহী হয়নি। দিন দিন তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রথম স্বামী যে আবেগে স্বধর্ম ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করেছিলেন সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে খুব দ্রুতই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। এরপর আশ্রয় হয়ে ওঠা ফারুক ঠাকুরও খুনের ঘটনায় হারিয়ে গেলেন। ফারুকের এই ঘটনার সময়ও প্রচুর অর্থবিত্ত ছিল তার। কিন্তু সবকিছুতেই যেন পতন শুরু হয়। চতুর্দিক থেকে লোক জড়ো হতে থাকে তার টাকাগুলো মেরে দেয়ার জন্য। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি কেউ ব্যবসা করে দেয়ার নামে। কেউ অল্পদিনের জন্য ঋণ নেয়ার নামে প্রায় কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স অল্পদিনের মধ্যেই

নিঃশেষ করে দেয়। বনশ্রী এরপর ধানমণ্ডিতে একটি বিউটিপার্লার করেন। সে ব্যবসাও তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নিজের চেয়েও কমবয়সী এক ছেলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বাড্ডার বসতিতে নতুন স্বামী নিয়ে সংসার শুরু করেন। পালছেঁড়া জীবনতরীর দুর্বল মাঝি হলেও এই স্বামী তার জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে। কিন্তু একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে সেই মানুষটিও বনশ্রীকে নিঃসঙ্গ করে পরপারের যাত্রাপথে রওয়ানা হন।

বনশ্রী খুবই বিলাসী, অলংকারপ্রিয় ও সৌন্দর্যসচেতন ছিলেন। জড়োয়া গহনা এবং মোটা ও পুরু অলঙ্কার ছাড়া কখনও এফডিসি মাড়াতেন না। অভিনয়ের সময়েও শরীরে জড়ানো থাকত মূল্যবান অলঙ্কার। যে কয়জন লোকের মূল্যবান গাড়িতে সে সময়ের রাজধানীর পিচঢালা পথ প্রকম্পিত হতো, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে গাড়িও পরিবর্তন হয়েছে, গাড়িতে ওঠার উদ্দেশ্যও পরিবর্তন হয়েছে। জীবনতরীর পাল, মাস্তুল, মাঝি-মাল্লা সবই বিধ্বস্ত হয়েছে। জীবন থেকে সরে গেছে একে একে সব অবলম্বন।

সর্বশেষ যে ঝড় তার জীবনের শেষ অবলম্বন নিশ্চিহ্ন করে দেয় তার ধকল সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম ঘরের অষ্টম শ্রেণির মেয়েটিকে তার পরিচিত লোকেরা হাইজাক করে। তিনি মেয়ের শূন্যতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান। ছুটতে থাকেন থানায় থানায়। বিচার চান এই অমানবিক অন্যায়-অপরাধের। কিন্তু সবাই তাকে

নিরাশ করে। নিবৃত করেন নিজকন্যার দাবি থেকে! এ কোন দুঃসহ সমাজে বাস করছি আমরা? একজন হতভাগা মা তার কন্যা অপহরণের বিচার নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করার পরও আইন তার সহায়তা না করে অপরাধীর সহায়তা করে!

বনশ্রী অনেক কাকুতি-মিনতি করেন হাইজাকারদের কাছে একমাত্র অবলম্বন নিজের বুকে ফিরিয়ে দেয়ার। কিন্তু হৃদয় গলে না পাষণ্ডদের। তারা তাকে বিক্রি করে দেয় খারাপ জায়গায়। বুকটা ফেটে যায় বনশ্রীর। নিজকন্যার এই পরিণতি তিনি কিছুতেই বরদাশত করতে পারেন না। একরাশ বেদনা, হতাশা ও জীবনধারনের শেষ অবলম্বন হারিয়ে তিনি রাস্তায় নামেন। পরের ঘরের মাত্র তিন বছরের শিশু সন্তান নিয়ে সিনেমার মতোই অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়ে আজ ফুটপাতে বই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন বনশ্রী। জীবিকার প্রশ্নে আশ্রয় নিয়েছেন এমন এক অবলম্বন, যা মুসলিমদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। তিনি বাসে বাসে নামাজ শিক্ষার বই বিক্রি করতে থাকেন। অনেকে তার পরিচয় পেয়ে হতবিহ্বল হন। নামাজ শিক্ষার বইয়ের কারণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এভাবেই চলছে একজন খ্যাতিমান তারকার দুঃখের জীবন। যাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নাটক-সিনেমার রঙিন জগত তারা উল্কাবেগে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, তেমন এক নায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বহুদিন আগের পথ-পরিচয়ের কোনো অস্পষ্ট স্মৃতি যেমন কেউ খুব

কষ্ট করে মনে করে, ঠিক তেমনি তিনি বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই নামের একজন নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম! সত্যিই স্যালুকাস! এই জীবনে না আছে দায়, না আছে হৃদয়। কেবলই অভিনয়, প্রবঞ্চনা আর শঠতা। এই শঠতা দিয়েই ধ্বংস করা হচ্ছে হাজার তরুণ-যুবকের জীবন। হতভাগ্য যুবক তা বোঝে জীবনসায়াহ্নে, জীবনভেলা ভাঙাতীরে ভেড়ার পর!

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে, বনশ্রী এই সমাজব্যবস্থা, মানুষের সীমাহীন লৌকিকতা ও পাষণ্ডতার প্রতি তীব্র বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তিনি চরম আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি আমার ছেলেকে আলেম বানাবো। সারাবিশ্বের মানুষকে সে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকবে। আমি নায়ক বানাবো না। কেননা, নায়ক হলে মদ খাবে, আমাকে ভালোবাসবে না।'

এটাই কুদরতের খেলা! কিছুদিন আগে এক রাজনীতিক বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন। কী স্পর্ধা! আল্লাহ তা'আলা যাদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত দীন জিন্দা রাখবেন, কুরআন-হাদীসের আলো ও নূর যাদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রাখবেন তাদের সংখ্যা কমানো মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা? নাকি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা! আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»

‘যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলী বা প্রিয় কারও সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দেই।’ [বুখারী : ৬৫০২]

কুরআন ও কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো উদ্যোগ সফল হবে না ইনশাআল্লাহ। যারা এর অপপ্রয়াস চালাবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর ঘোষণা :

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ٣٢ ﴾ [التوبة: ٣٢]

‘তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২}

আরেক আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨]

‘তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।’ {সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮}

ইহুদী-খ্রিস্টানদের সমাজে এবং একজন খ্রিস্টান রমণীকে বগলদাবা করে সংসার করা পাশ্চাত্য ভাবনার এক বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব

এরূপ ইসলামবিরোধী ঘোষণা দেয়া। কিন্তু যারা বাস্তবজীবনে ঠোকরের পর ঠোকর খেয়েছেন, তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বৃত্তায়নে যাদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে, যে শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ একজন বিপন্ন নায়িকার বুক থেকে নিজের মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং যে শিক্ষার সার্টিফিকেটধারীদের কাছে প্রতিকার চাইতে গিয়ে উল্টো হয়রানীর শিকার হয়েছেন সেই শিক্ষার প্রতি তার জেগেছে ঘৃণা, ক্ষোভ ও মর্মপীড়া।

তাই তিনি এমন এক শিক্ষার আশ্রয় নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন যে শিক্ষায় সরলতা, সততা, মমতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা আছে। আছে দেশ, মানবতা ও ইসলামী ভাবনার মহত্তম চিন্তা। যে শিক্ষায় নেই প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, অস্ত্রবাজি, টেন্ডারবাজি। নেই ধর্ষণের নূন্যতম অভিজ্ঞতা। সুতরাং সেই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামবিদ্বেষীদের বগলদাবায় বসবাস করা খিস্ট্রান রমণীর স্বামী একজন নেতা হঠাৎ উড়ে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও করতে পারে। কিন্তু জীবনবাস্তবতায় যিনি সমধিক পরিচিত, তিনিই বোঝেন কোন শিক্ষার কী ফল। তাই তো পোড় খাওয়া ব্যক্তি বনশ্রী বলতে পারেন, ছেলেকে আলেম বানাবো, যাতে করে সে বিশ্বের সকলের সেবা ও খেদমত করতে পারে। মা-বাবাকে ভালোবাসে, মাদক অনাসক্তিতে থাকে।

এফডিসি নামের যে আনন্দশালা সদা মুখরিত থাকে এবং বনশ্রী ও অন্যান্য অভিনেত্রী-অভিনায়কদের জীবন ছিল মুখরিত, যেখানে নিত্য

রচিত হয় হাজারও কল্পকাহিনী, যেখান থেকে পরিকল্পনা করা হয় অভিনিত অবাস্তব নাট্যের কারসাজিতে দর্শকদের অশ্র“সিক্ত করার মহড়া, সেখানে যে প্রকৃতপক্ষেই হৃদয়ঘটিত কোনো আবেগ ও সহমর্মিতা নেই তার প্রমাণ পেয়েছেন বনশ্রী নিজেই। বিপদগ্রস্ত হয়ে এফডিসির শিল্পী সমিতিতে সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো শিল্পী তার দিকে মুখ ফিরিয়েও তাকাননি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি সেই গন্তব্যেই ফিরে আসার চেষ্টা করছেন, যা শতসহস্র বছর ধরে ধরার বিভিন্নপ্রান্তের সহায়-সম্বলহীনদের আশ্রয়, যাঁর দরবার কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, যেখানে প্রত্যাবর্তনকারীকে সমাদর করা হয় পরম ক্ষমার ঐশ্বর্যে। তাইতো বনশ্রীর মুখে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সত্য ও ঘরে ফেরার আকুলতা। আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের শ্বাশত অভিপ্রায়। মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে-

‘আমি সর্বদা আল্লাহ তা‘আলাকে ডাকি, ইবাদত বন্দেগি করি। ‘নামায শিক্ষা’র বই বিক্রি করি। একটা লোক আমাকে সাহায্য করেছে। এক সাংবাদিক আছে, যিনি ইয়ং বয়সে আমাকে কাভারেজ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বাসে দেখেছেন বই বিক্রি করছি। আমাকে তিনি প্রথমে চিনেননি আমিই পরিচয় দিয়েছি। এরপর তার সহায়তায় নিউজ হয়েছে।

‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে বলি, হে আল্লাহ তা‘আলা, তুমি সব জানো। যারা আমার বুক খালি করেছে তুমি তার বুক খালি করো। আমার ছেলে আজ কারো বাড়িতে যেতে পারে না। বস্তিতে থেকে থেকে আমি কি যেন হয়ে গেছি। দু‘আ করবেন আল্লাহ তা‘আলা যেন

আমার ওপর রহমত নাযিল করেন।' আরেকটি কথা বলুন, যে লোকটি পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে সে কীভাবে আমার বুক খালি করে দিলো? আসলে দেখুন ও কীসের মুসলিম। আমি মেয়েকে দশ মাস বুকে লালন করেছি। সে আমার বুক খালি করে দিল? আমি এই ছেলেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করছি।'

কাকুতির সঙ্গে আছে বিধ্বস্ত সমাজের অবাঞ্ছিত ফসল থেকে আশ্রয়। ঐশী (উচ্ছৃঙ্খল ও নেশার জীবনের প্রতিবন্ধক মনে করে যে মাবাবাকে একই সঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল) তো হাল-আমলের বখে যাওয়া সমাজ সংসারের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। বনশ্রী নিজ সন্তানকে সেরকম কিছু দেখতে চান না। তাই আকুতির সঙ্গে ঝরে পড়ছে শঙ্কাও। তিনি বললেন, 'নাকি আমার মেয়েকে ঐশী বানাচ্ছে? আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই। আমি আমার মেয়ের সুন্দর ও শালীন জীবনে দেখতে চাই। ঐশীর মতো দেখতে চাই না।'

হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বনশ্রীর এই ফিরে আসাকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ তা'আলা তার বর্তমান ও পরকালীন জীবন সুন্দর করুন। তার ছেলেকে আলেম বানানোর যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছেন তা বাস্তবায়ন হোক। যেসব ইসলামবিদ্বেষী ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের চর এদেশে ইসলাম থাক, মুসলিম থাক, ইলমে দীনের শিক্ষা থাক তা বরদাশত করতে পারে না, যারা আলেম কমানোর নামে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা দেখুক ইলমে দীনের মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও নির্মলতা। বনশ্রীর সেই হতদরিদ্র রোগা ছেলেটি এদেশের একজন

মস্ত বড় আলেম হয়ে আল্লাহদ্রোহীদের মুখে চপেটাঘাত করুক আল্লাহর কাছে মনেপ্রাণে সেই কামনাই করি।

আফসোস হয় ক্ষমতাসীনদের দেখে। এরা বিদেশীদেরকে এভাবে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, তাদের কথায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা, ইসলামের বৈরিতায় তৃপ্তি পায়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ইলমে দীনের বিরুদ্ধে। অথচ আমাদের পূর্বপরবর্তী মুসলিম শাসকগণ শুধু ইলমে দীনই নয়; যে কোনো ধরনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। খলীফা মামুন এমন সব নিত্যনতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন যা আজকের প্রেক্ষাপটে বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলে না মেনে উপায় নেই। আর ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে তো ছিলেন জীবনোৎসর্গকারী।

পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের রাজা-বাদশা ও ক্ষমতাশালীরা নিজেদের সন্তানদেরকে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় পারদর্শী করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন এবং কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের মৌলিক বিদ্যা থেকে তাদের একেবারেই বঞ্চিত করেন। অতীতের কীর্তিমান শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা তাদের সন্তানদেরকে কুরআন-হাদীসের ইলম দান করে ধন্য হতেন এবং সন্তানদের জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করতেন। বেশিদিন আগের কথা নয়। মোঘল সম্রাট আলমগীরের কথাই ধরুন। ভারত শাসন করেছেন যাঁরা, তাদের কয়জন তার মতো কৃতিত্ব ও ইতিহাসে স্মরণীয় হতে পেরেছেন?

‘বাদশা আলমগীর,

কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লির’

হৃদয়কাড়া কবিতার এ অংশই প্রমাণ করে বিখ্যাত মোঘল সম্রাট পুত্রের জন্য কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত ইলম-অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়ার গ্রন্থ ‘ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী’ তারই তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আগের যুগের সব খলীফা ও আমীর-উমারা এরূপই ইলমের প্রতি সীমাহীন অনুরাগী ছিলেন। যেমন বিখ্যাত শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার পুত্রকে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন, ‘হে বৎস! ইলম শিক্ষা করো। কেননা যদি নেতা হও তবে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। যদি মধ্যম ধরনের লোক হও তবে নেতার আসন লাভ করতে পারবে। আর যদি সাধারণ প্রজা হও তবে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারবে।’

এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

ومن لم يذق مر التعلم ساعة   تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه   فكبر عليه أربعا لوفاته

وذات الفتى والله بالعلم والتقى   إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের কিঞ্চিত তিক্ততা বরদাশত করে না, সে দিনের পর দিন মূর্খতার লাঞ্ছনা গিলতে বাধ্য হয়। যৌবনে যার ইলম শিক্ষা করার সুযোগ হয়নি তার ওপর (জানাযার) চার তাকবীর পাঠ করো। কেননা সে তো মৃত! আল্লাহ তা‘আলার শপথ! যুবকের মর্যাদা

ও শ্রেষ্ঠত্ব তার ইলম ও তাকওয়ার কারণে। আর যদি এই দুটি বস্তু না থাকে তবে তার কোনো মূল্যই নেই।’

কোথায় ইতিহাসের একজন নামকরা প্রতাপশালী শাসক খলীফা মারওয়ান আর কোথাকার কোন নচ্ছান দুদিনের নেতা! যারা কীর্তিমান, যারা মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার জায়গা করতে চান তারা কখনও জ্ঞান ও ইলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না। ইলমের সঙ্গে যুদ্ধ! সে তো তারাই পারে যারা মানুষের হৃদয়ে আবর্জনার মতো ঘৃণা হয়ে ভাসমান থাকতে চায়।

বনশ্রীর জীবনের গল্পটা শেষ করি কবির ‘কাব্যগল্প’ দিয়ে-

একুল ভাঙে ওকুল গড়ে এই তো নদীর খেলা

সকাল বেলার আমীর রে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা

রে ভাই এই তো বিধির খেলা....

## ভ্রষ্টবিহঙ্গ : খুঁজে ফেরে নীড়

তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশের এক বিপথগামী লেখিকার প্রতিচ্ছবি। নামটা শুনলে যে কারো চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অশ্লীল রিপুতাড়িত উগ্র নারীর অবয়ব। শুধু নিজের শরীর ও জীবন-যৌবনকেই তিনি পানির দরে পুরুষজাতির সামনে উপস্থাপন করেননি, বরং অন্য নারীদেরকেও তিনি এই পথে আহ্বান করেছেন। নগ্নতার ইন্ধন যুগিয়ে তিনি শুধু নিজেকেই ধ্বংস করেননি, বরং

ধ্বংস করেছেন একটি সমাজকে, নিজের পরিবারকে এবং দেশের বৃহৎ লেখক গোষ্ঠীকে। বাংলাদেশের বহু নামকরা লেখককে তিনি যৌবনের বড়শি দিয়ে শিকার করেছেন খুব সহজেই। আবার তাদের এসব 'কীর্তি'র কথা প্রকাশও করেছেন নির্দ্বিধায়। ফলে তসলিমা এখন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশে তাওহীদপ্রেমী জনতার আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না, তার এই অভিসারসঙ্গী এলিট শ্রেণীরাই আন্দোলন করে তাকে প্রতিহত করবে!

তসলিমার কোনো বই সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। কেউ তা সাহিত্যের বিচারে মূল্যায়নও করে না। তিনি নিজেও নিজেকে সাহিত্যসম্পন্ন বলে মনে করেন না। বাবা তাকে একজন ডাক্তার বানিয়েছিলেন। তার কাজ ছিল অসুস্থ মানুষের দেহে ইনজেকশনের সূঁই ফুটিয়ে সুস্থ করে তোলা। কিন্তু তিনি সেই পথ ছেড়ে আনাড়ি হাতে কলম নিয়ে তা দিয়ে সুস্থ মানুষের দেহে সম্ভ্রমহানীর হুল ফোটাচ্ছেন। সাহিত্যমানের জন্য নয়; মানুষ তার বই পড়ে অসুস্থ সুখ লাভের উদ্দেশ্যে। এরা হলো গ্রামগঞ্জের বাজারী হকারদের মতো; যারা রোগের চটকদার বিবরণে শ্রোতা সংগ্রহ করে মুহূর্তেই বিরাট মজমা জমিয়ে তোলে। কিন্তু কিছু বোকা শ্রোতা ছাড়া অধিকাংশ লোক তাদের কথা ও দাওয়া কোনোটাই গ্রহণ করে না।

সুতরাং তসলিমার লেখা এধরনের অশ্লীলতা সম্বলিত কোনো বই পড়ার গরজবোধ করিনি কখনও। তবে ঢাকার ফুটপাত থেকে পুরান বই কেনার অভ্যাস আছে আমার। এসব দোকান থেকে জীবনে অনেক মূল্যবান বই দেখা ও কেনার সুযোগ হয়েছে। তাই ওদিকে

গেলে পুরান বইয়ের বাজারে একটু উঁকি না দিলে স্বস্তি পাই না। একবার বাংলাবাজার থেকে আসতে এভাবে উঁকি দিলাম ফুটপাতের একটি পুরান বইয়ের দোকানে। সাদা মলাটে বাঁধানো একটি বইয়ে দৃষ্টি আটকে গেল। 'আমি তসলিমার মামা বলছি' শিরোনামের বইটি কিনতে বিলম্ব করলাম না। একটা মেয়ে কেন এত বেপরোয়া, উচ্ছৃখল এবং অস্বাভাবিক পথে হাঁটা শুরু করল তা জানার কৌতূহল বইটি কিনতে আমাকে উৎসাহিত করল। বইয়ের লেখক তসলিমার মামা লেখক নন এমনকি উচ্চ শিক্ষিতও নন বলে ভূমিকা পাঠ করে বুঝা গেলো। নিতান্তই ভাগ্নির কলমের খোঁচায় জর্জরিত হয়ে অপারগ হয়ে কলম ধরেছেন তিনি। তসলিমা তার গোটা পরিবারকে দেশবাসীর সামনে কত নির্মম ব্যভিচারী পরিবার হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তা ফুটে উঠেছে তসলিমার মামার কাঁচা হাতের লেখা এই বইয়ে।

তসলিমা নিজেও তার এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, তিনি তার পরিবারকে অত্যন্ত নির্মমভাবে 'জবাই' করেছেন। তার জবাইয়ের নির্মমতা কত ভয়াবহ হতে পারে তা ওই বইটি পড়েও কিছু আঁচ-অনুমান করা যায়।

তিনি অত্যন্ত নোংরা ভাষায় মা, বাবা, চাচা, মামা, ভাইবোন এবং নিকট ও দূর সম্পর্কের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনকে অত্যন্ত কামুক পশুসম চরিত্রের মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব কথা লেখার সময় তসলিমার মস্তিষ্ক সুস্থ ছিল কিনা, কখনও কখনও সন্দেহ হয়। যিনি নিজের জীবনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহুপুরুষের ভোগের সামগ্রী

ভাবতে পছন্দ করেন, একে একে স্বামী ছেড়ে বহুগামিতায় বিকৃত সুখ ও অর্থবিত্ত খোঁজেন, আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে অকপটে কুৎসা রটনা করেন, কুরআন-হাদীস ও ইসলাম-মুসলমানের বিরুদ্ধে চরম বিষোদগার করেন, জীবনের পড়ন্তবেলায় সেই তসলিমা কেমন আছেন তা মাঝে মাঝে জানার কৌতূহল হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক ফরহাদ মজহার তার এক লেখায় ইউরোপিয়ান এক জরিপের ফলাফল উল্লেখ করেছেন। জরিপটা ছিল নাস্তিকদের বিষয়ে। জরিপে উল্লেখ করা হয়, অধিকাংশ নাস্তিক জীবনের পড়ন্ত কিংবা মাঝবেলায় আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার এবং আড়ালে-আবডালে তাঁকে মান্য করতে তৎপর হয়ে ওঠে।'

জরিপের এই ফলাফল পরম বাস্তব তথ্য। একজন মানুষ কতকাল আর প্রবৃত্তির পূজা করে বাঁচতে পারে? এক আল্লাহয়, এক স্রষ্টায়, এক মালিকের বিশ্বাস ও ইবাদতে যে তৃপ্তি, নির্ভরতা ও দায়মুক্তির নিশ্চয়তা বহু আল্লাহয় তার কল্পনাই করা যায় না। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তাই সঙ্গত কারণেই জীবনের পড়ন্ত কিংবা মাঝবেলায় এসে অনেক নাস্তিক বেকারার হয়ে যায়, খোঁজে ফেরে প্রকৃত আল্লাহকে। ভ্রষ্টবিহঙ্গের মতো। যে উদগ্রীব হয়ে খোঁজে তার নীড়। আসলে খেঁড়পাতের সবুজাভ স্পন্দন কতদিনই বা থাকে? একসময় স্পন্দন শেষ হয় এবং বৃক্ষ থেকেই তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই জীবনের এই উন্মাদনা থাকে না চিরদিন। আল্লাহর গোলামীতে নিজেকে সঁপে দিতেই হয় কোনো না কোনো সময়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ ١١ ﴾ [فصلت: ١١]

'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।' {সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : **১১**}

বিরাট এক ভূমিকা পেশ করে ফেললাম। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য তসলিমার একটি সাক্ষাৎকার। জীবনে কতবার, কতভাবে আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে 'পার্বত্য নিউজ' নামে একটা পত্রিকায় তার দেয়া সাক্ষাৎকারে আছে নীড়ে ফেরার আকুলতা, অতীত জীবনের পাপমোচনের দায়বদ্ধতা। সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম এমন-

'মাঝেমধ্যে মনে হয় সব ছেড়ে নামাজ-রোজা করি, তওবা করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

বিভিন্ন সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে যাযাবরি জীবনযাপন করা তসলিমার এখন বিশাল পৃথিবীর কোথাও জায়গা হচ্ছে না। হবেই বা কী করে? জমিন যে আল্লাহ তা'আলার!

﴿ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ ﴾ [فاطر: ١٣]

‘তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।’ {সূরা ফাতির, আয়াত : ১৩}

তাই পৃথিবীর কোনো জমিনই নাস্তিক ও আল্লাহদ্রোহীর ভার বহন পছন্দ করে না। ফলে জীবনের পড়ন্ত বেলায় এখন তিনি হতাশ। কমে গেছে সেই তারুণ্যময় উচ্ছৃঙ্খল লেখালেখি। ‘সবকিছুর একটা শেষ আছে’ সেই সত্য এখন তার অনুভবে স্পষ্ট। ভুল, হতাশা ও হতাশা থেকে নতুন উপলব্ধি, শঙ্কা-দোদুল্যমানতার মধ্যে দিন কাটছে তার। নিজেই ভাবছেন, ‘মাঝেমধ্যে মনে হয় সব ছেড়ে নামাজ-রোজা করি, তওবা করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ কম্যুনিস্টরাও তো এক সময় বদলে যায়। পার্বত্য নিউজে দেওয়া তার ওই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে এধরনের অকল্পনীয়  কিছু তথ্য। একজন স্বঘোষিত নাস্তিকের এ বাস্তবজীবনের অনুভূতি প্রকাশ করতে সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ তুলে ধরা যাক। তবে পাঠকের পূর্ণ অনুমানের জন্য কাটছাঁট না করে সাক্ষাৎকারের ওই পূর্ণ অংশ উপস্থাপন করা হলো।

[আলোচিত এই সাক্ষাৎকারের কথায় পরিষ্কার, এখন তিনি হতাশ, চোখের নিচে কালি পড়েছে, চামড়ায় বয়সের ছাপ, শরীরের মধ্যে নানারকম ব্যথা-বেদনা তো আছেই। একাকিত্ব তাকে আরও পঙ্গু

করে দিচ্ছে। এমন অবস্থায় বিদেশের কোথাও থিতু হতেও পারছেন না। দেশে ফেরাও তার জন্য দিন দিন কঠিন হয়ে গেছে। যে প্রতিবাদী ঈমানদার জনতার ভয়ে দেশ ছেড়েছিলেন, সে ভয় এখনও তাকে তাড়িয়ে ফিরছে। তিনি বলেছেন, লন্ডন থেকে দিন কয়েকের জন্য গিয়েছিলাম ভারতে। আর কাকতালীয়ভাবেই দেখা গেলো এই বিতর্কিতা লেখিকা ডা. তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে। তিন দিনের নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হলো। এ বিষয়গুলো তুলে ধরতেই আজকের এই প্রয়াস। সাক্ষাৎগ্রহীতার ভাষ্য]

**‘প্রশ্ন :** আপনার কাছে একটা প্রশ্ন। এই যে লেখালেখি করলেন, এর মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, দেহের স্বাধীনতা না চিন্তার স্বাধীনতা?

**তসলিমা নাসরীন :** প্রশ্নটি আপেক্ষিক। আসলে আমিতো পেশায় ছিলাম চিকিৎসক। আমার বাবা চেয়েছিলেন তার মতো মানে অধ্যাপক ডা. রজব আলীর মতো আমিও একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক হই। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনে আমি অনুভব করি, নারীরা আমাদের সমাজে ক্রীতদাসীর মতো। পুরুষরা তাদের ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করে। এ কারণেই বিষয়গুলো নিয়ে প্রথমে লেখালেখির কথা ভাবি।

**প্রশ্ন :** আমার প্রশ্নের জবাব হলো না। কী স্বাধীনতার দাবিতে আপনার এ লড়াই?

**তসলিমা :** আমি প্রথমত নারীর জরায়ুর স্বাধীনতার দাবি তুলি। একজন পুরুষ যখন চাইবে, তখনই তার মনোস্কামনা পূর্ণ করতে ছুটে যেতে হবে। এটা তো হতে পারে না। অথচ তখন ছুটে না

গেলে জীবনের সব পুণ্য নাকি শেষ হয়ে যাবে। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে ভালো লেখক হওয়া যায় না। দেহের স্বাধীনতার বিষয়টা গৌণ। তবে একেবারে ফেলনা নয়। পুরুষই একচেটিয়া মজা লুটবে, নারী শুধু ভোগবাদীদের কাছে পুতুলের মতো হয়ে থাকবে, এটা মেনে নিতে পারিনি।

**প্রশ্ন :** আপনি পরিকল্পিতভাবে নিজেকে আলোচিত ও অপরিহার্য করে তোলেন। আজ বাংলা সাহিত্যে বা বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে আপনি তো চরমভাবে অবহেলিত।

**তসলিমা :** আমি একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি। সত্য কথা সাহিত্যে এলে তা অনেকের জন্য কষ্টদায়ক হয়। আমি আমার বহু স্বামী ও ভোগ্য পুরুষদের নামধাম প্রকাশ করে দেওয়ায় অনেক বন্ধু আমাকে এড়িয়ে চলেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক দামি দামি পুরুষও চান না যে আমি দেশে ফিরি। এক সময় আমার বিপক্ষে ছিল কট্টর মৌলবাদীরা। এখন প্রগতিশীল অনেক সাহিত্যিকও বিপক্ষে। কারণ এদের নষ্ট মুখোশ আমি খুলে দিয়েছি।

**প্রশ্ন :** আপনি চিকিৎসক থাকলেই ভালো করতেন। মিডিয়াতে কেন এলেন? সাহিত্যেই বা কেন ঢুকলেন?

**তসলিমা :** আমি নারীর অধিকার নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু এখন মনে হয় আমি মানবিকভাবে আশ্রয়হীন। আর এ কারণেই আমি অন্য স্রোতে সুখ খুঁজেছি। পরিবার হারালাম, স্বামী সন্তান হলো না, ঘর-সংসার হলো না। তখন দৈহিক সম্পর্কে নেশাগ্রস্ত না থেকে আর কোনো পথ খোলা ছিলো না।

**প্রশ্ন :** এখন আপনি কী চান?

**তসলিমা :** অনেক কিছু। আমার হারিয়ে যাওয়া জীবন, যৌবন, ভোগ-উপভোগ, স্বামী-সন্তান, পরিবার-পরিজন। কিন্তু দিতে পারবেন কি? আজ আমি নিজ দেশের কাউকে দেখলে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। খ্যাতি, অর্থ, পুরস্কার সবই আছে, তবুও মনে হয় আমি ভীষণ পরাজিত। দিনে হইচই করে কাটাই, রাত হলে একাকিত্ব পেয়ে বসে। আগের মতো পুরুষদের নিয়ে রাতকে উপভোগ করার মতো দেহ-মন কোনোটাই নেই।

**প্রশ্ন :** পুরনো বন্ধুরা যোগাযোগ রাখেনি? এখন কেমন পুরুষ বন্ধু আছে?

**তসলিমা :** এক সময় অনেক ব্যক্তিত্ববানদের পেছনে আমি ঘুরেছি। ব্যক্তিত্বহীনরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরেছে। আজকাল আর সুখের পায়রাদের দেখি না। মনে হয় নিজেই নিজেকে নষ্ট করেছি। পরিচিত হয়েছি নষ্ট নারী, নষ্টা চরিত্রের মেয়ে হিসেবে। লেখালেখি করে তাই এসব পুরুষদের ওপর আমার রাগ, ঘৃণা ও অবহেলা প্রকাশ করেছি। চরিত্রহীনতার রাণী হিসেবে প্রকাশিত হলাম, অথচ এই রাণীর কোনো রাজাও নেই, প্রজাও নেই। এ জন্য আজ হতাশায় নিমজ্জিত আমি।

**প্রশ্ন :** ধর্ম-কর্ম করেন?

**তসলিমা :** মাঝেমধ্যে মনে হয় সব ছেড়ে নামাজ-রোজা করি, তওবা করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি। কম্যুনিস্টরাও তো এক সময়

বদলে যায়। আমার জন্ম ১২ই রবিউল আউয়াল, মহানবীর জন্মদিনে। নানী বলেছিলেন, আমার নাতনী হবে পরহেজগার। সেই আমি হলাম বহু পুরুষভোগ্যা একজন ধর্মকর্মহীন নারী। বলা তো যায় না, মানুষ আর কতদিন বাঁচে। আমার মা ছিলেন পীরের মুরীদ। আমিও হয়ত একদিন বদলে যাবো।

**প্রশ্ন :** বিয়ে-টিয়ে করবার ইচ্ছে আছে কি?

**তসলিমা :** এখন বিয়ে করে কী করবো? পুরুষটিই বা আমার মধ্যে কী পাবে? সবই পড়ন্ত বেলায়। যে বিয়ে করবে, সে যদি আমার মধ্যে কিছু না চায়, সন্তান না চায়, এমন মানব পেলে একজন সঙ্গী করার কথা ভাবতেও পারি।

**প্রশ্ন :** আপনি কি একেবারে ফুরিয়ে গেছেন?

**তসলিমা :** না, তা ঠিক নয়। তবে পুরুষতো শত বছরেও নারীকে সন্তান দেয়। মেয়েরা তা পারে না। আমি এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তবে নতুন বা আনকোরাতো নয়। পুরুষদেরও বয়স বাড়লে আগ্রহ বেড়ে যায়। এতটা মেটানো তো আর এই বয়সে সম্ভব হবে না।

**প্রশ্ন :** বয়স বাড়লে পুরুষের চাহিদা বাড়ে এটা কীভাবে বুঝলেন?

**তসলিমা :** কত বুড়ো, মাঝবয়সী ও প্রবীণ বন্ধুদের নিয়ে মেতেছি, এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

**প্রশ্ন :** রাত যখন বিশ্বকে গ্রাস করে, আপনার ঘুম আসছে না তখন আপনার বেশি করে কী মনে পড়ে?

**তসলিমা :** খুব বেশি মনে পড়ে আমার প্রথম প্রেম, প্রথম স্বামী, প্রয়াত কবি রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে। অনেক কাঁদি তার জন্য। পেয়েও হারালাম তাকে। রাগ হয়েছিল বিয়ের রাতেই। (অশ্লীল হওয়ায় পরের অংশ বাদ)

**প্রশ্ন :** অন্য স্বামীদের কথা মনে পড়ে না?

**তসলিমা :** তারা এমন উল্লেখযোগ্য কেউ নন। তাদের মুরোদ আমি দেখেছি। তার চেয়ে বহু বন্ধুর মধ্যে আমি দেখেছি কেমন উন্মত্ত তেজ। ওদের স্মৃতি মনে পড়ে মাঝে মধ্যে।

**প্রশ্ন :** দেশে ফিরবেন না?

**তসলিমা :** দেশই আমাকে ফিরতে দেবে না। আর কোথায় যাবো? বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে আমি লেখাতে জবাই করে দিয়েছি। আসলে নেশাগ্রস্তই ছিলাম, অনেক কিছু বুঝিনি। আজ আত্মীয়-স্বজনও আমাকে ঘৃণা করে। মরার পর লাশ নিয়ে চিন্তা থাকে, আমার নেই। যে কোনো পরীক্ষাগারে দেহটা ঝুলবে। ছাত্রদের কাজে লাগবে।'

এই হলো ধর্ম, সমাজ ও নির্মল সংস্কৃতির বিপরীত মেরুর প্রবক্তা রুচিহীন নাস্তিক মহিলা। যৌন স্বাধীনতা দাবি করে বিতাড়িত হয়েছে দেশ থেকে, মাতৃভূমি থেকে এবং নারীত্বের কাতার থেকে। পেয়েছে কেবল বিধর্মীদের এঁটে কয়েক মুঠো ভাত। কিন্তু এখন তাও বাসি হয়ে গেছে। তাই আকুলতা বাড়ছে ফিরে আসার, আপন নীড়ে ঠিকানা করে নেওয়ার। সব বিহঙ্গই সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফেরে। মানুষের

জীবনেও সন্ধ্যাবেলা আছে। জীবন সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময় থাকে মানববিহঙ্গের ঘরে ফেরার। জানি না তসলিমার সেই সুযোগ হবে কিনা? আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি ঘরে ফিরুন। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েই কবরের পথ ধরুন। তাকে দেখে শিখুক তার ভাবগুরু ও ভাবশিষ্য অসংখ্য ধর্মদ্রোহী ও ইসলামবিদ্বেষী নারী-পুরুষ।

## আমরা নব্য জাহেলিয়াতের বাসিন্দা! কারণ-১

ইতিহাসের আইয়ামে জাহেলিয়া তথা জাহেলী যুগকে গালমন্দ করি। অসভ্য, বর্বরতার দৃষ্টান্ত দিতে এই যুগের নাকি তুলনা নেই! নির্মমতা, পাশবিকতা ও অশ্লীলতার দরজা-জানালা খুলে ওই যুগের লোকেরা নাকি সভ্যতার দিগম্বর প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল! পক্ষান্তরে আমরা জাহেলিয়াতের সেই কলঙ্কজনক অধ্যায় দূরে ঠেলে রকেট গতিতে সভ্যতার স্বর্ণশিখর ও মানবিকতার মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে গেছি! কিন্তু বাস্তবতা আসলে কী? আমরা কি সত্যিকার অর্থেই জাহেলিয়াতের আখ্যান থেকে পলায়ন করছি, না জাহেলিয়াতের নগ্ন-ময়দানে ততোধিক দিগম্বর সাজে নৃত্য করছি?

জাহেলী যুগে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা আজ আমাদের তথাকথিত সভ্য ও বিজ্ঞানময় সমাজদেহে আছড়ে পড়ে পাশবিকতা ও অশ্লীলতায় ক্ষুদ্রতার দোষে অভিযুক্ত হয়ে ছিটকে পড়ছে! সে সময়ের জাহেলীপনা ছিল মন্থর, উটের শ্লথ গতির। কিন্তু আজ যে অশ্লীলতা ও পাশবিকতার ছড়াছড়ি তা জাহেলিয়াতের সকল জাহেলী ও দস্যিপনাকে ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ জাহেলীযুগের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়সের কথাই ধরুন। তিনি এক কবিতায় তার নারী সম্ভোগের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন বেশ নগ্ন ও অশালীনভাবে সেকথা অস্বীকার করার জো নেই। তিনি লিখেছেন-আমি প্রেমিকার এক ডালিম খাই আর অপরটি চোষে তার শিশুবাচ্চা....

নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। বস্তুবাদী অধিকাংশ কবির যা মজ্জাগত স্বভাব। তাদের কবিতা নাকি নারীদেহের উপস্থিতি ছাড়া বাঙময় হয় না! একারণেই বলতে গেলে প্রত্যেক কবির কবিতায় নগ্নভাবে প্রকাশ পায় নারীদেহের কথা, কবিতার পরতে পরতে ভেসে ওঠে পরনারীর উত্তেজক নিলাজ অঙ্গের কথা। তাই একজন স্বভাবজাত ও জাহেলী সভ্যতার প্রভাবমিশ্রিত সমাজে বসবাসরত কবি থেকে এধরনের অশ্লীলতা প্রকাশ পাওয়া খুব অস্বাভাবিক বলে ধরা যায় না। কিন্তু আজ লেখক, কবি ও সভ্যতার দাবিদারদের থেকে যেসব কাব্য-কবিতা ও আত্মকথা প্রকাশ পাচ্ছে তা কোনো সভ্যতার যুগ হিসেবে তো নয়ই; জাহেলী যুগের লোকেরাও কল্পনা করতে পারবে না। এসব ঘটনাকে জাহেলী কাজ বললে আমার ধারণা জাহেলী যুগের লোকেরাও অপমানবোধ করবে। সব লোককেই কি পাগল বলা যায়, এতে পাগলের অবমাননা হয় না! বস্তুত আমরা জাহেলী যুগ পেরিয়ে গেছি চরিত্র আর নৈতিকতার প্রশ্নে। দেশ-বিদেশের দুটি ঘটনা পেশ করি।

এক. ইংল্যান্ড ফুটবল দলের এক সময়ের কোচ ভেন গেরান। জীবনসায়াহ্নে এসে তিনি তার আত্মজীবনী প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছেন। আলোচনার সুনামি বিশ্বমানচিত্রের সর্বত্র আছড়ে পড়ছে। বেশি আছড়ে পড়ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে। এদেশের একজন বেশ নামকরা যুবতী তার শয্যাশায়ী হয়েছেন এবং একজন মুসলিম যুবতী কীভাবে একটা বিধর্মী বুড়ো ষাঁড়ের নিকৃষ্ট গল্পের উপাদান হলেন তা পাঠ করে

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে অবাক হই এই সভ্য সমাজের কথা ভেবে, যে সমাজের একজন বৃদ্ধ অকপটে বলতে পারেন তার অবৈধ সম্পর্কের কথা? পুরো রিপোর্ট দেখুন :

এক রাতের ঘটনা। ভেন গোরান এরিকসনের বাসায় বাংলাদেশের মেয়ে মারিয়া আলম (ছদ্মনাম)। তারা একসঙ্গে এক টেবিলে বসে রাতের খাবার খেলেন। এরিকসনের বাসায় কোনো পরিচারিকা ছিল না। তাই এরিকসন নিজেই টেবিল পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনি টেবিলের ডিশ, প্লেট ধুয়ে ফেললেন। এসব যখন শেষ হলো তখন তিনি মারিয়া আলমকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন। পৌঁছে গেলেন তার বেডরুমে। সেখানে কাটে তাদের রাত। এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে ইংল্যান্ড ফুটবল দলের সাবেক ম্যানেজার ভেন গোরান এরিকসনের আত্মজীবনী ‘ভেন : মাই স্টোরি’তে।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটেনসহ পশ্চিমা দুনিয়ায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে। শুধু মারিয়া আলম নন, অনেক মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এরিকসনের। তাদের সবার কথাই এ বইয়ে তুলে ধরেছেন তিনি। আর তা নিয়ে বিশেষ করে বৃটিশ মিডিয়া তোলপাড়। তারা বিভিন্ন প্রতিবেদনে ফিরে যাচ্ছেন পেছনের দিনগুলোতে। তখন এরিকসনের সঙ্গে মারিয়ার সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়ে তারপর তাদের সম্পর্ক আস্তে আস্তে ভেঙে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে মারিয়া প্রকাশক ম্যাক্স ক্লিফোর্ডের কাছে তার কাহিনী ৫ লাখ পাউন্ডে বিক্রি করে দেন বলে খবর বেরিয়েছিল।

সেখানেই মারিয়া বলেছেন, ওই রাতের খাবার খাওয়ার পর এরিকসন আমাকে নিয়ে তার বেডরুমে প্রবেশ করেন। প্রথম দিন বা সেখানে কীভাবে তারা উদ্দাম সম্পর্কে মিলিত হন তার বিস্তারিত বর্ণনাও দেন। এরিকসন তাই লিখেছেন, ম্যাক্স ক্লিফোর্ডকে মারিয়া যে কাহিনী বলেছে তাতে রয়েছে আমাদের ওই রাতের শারীরিক সম্পর্কের গ্রাফিক্স বর্ণনা কিংবা বলা যায় সেন্সরবিহীন উন্মুক্ত কাহিনীর বর্ণনা। প্রথম ডেটিংয়েই তারা উদ্দাম শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন।

মারিয়া বলেছেন, ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী মার্ক পালিওর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৃপ্তির ছিল না। তবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অল্প সময়ের জন্য। অন্যদিকে এরিকসনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একেবারেই অন্য স্বাদের। তিনি দৈহিক লীলায় ঝানু ওস্তাদ। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক হয়েছিল তা ছিল অদ্ভুত। আবেগে ভরা। এক পর্যায়ে মারিয়া জেনে যান, ন্যান্সি ডেলওলিও নামে একজন ইতালিয়ান বান্ধবী আছেন। ভালোবাসার টানে তখন থেকে ৬ বছর আগে স্বামীকে ফেলে এরিকসনের কাছে চলে এসেছেন। ন্যান্সি সম্পর্কে একদিন মারিয়া জানতে চান। জবাবে এরিকসন বলেন তাদের সে সম্পর্ক এখন মৃত। এরিকসন বলেন, ন্যান্সির প্রতি শারীরিক আকর্ষণ অনেক দিন আগেই আমার উঠে গেছে।

এরিকসন স্বীকার করেছেন, তিনি ন্যান্সির কথা গোপন করেছিলেন। মারিয়াকে জানতে দেননি। ন্যান্সি ও এরিকসন একই বাড়িতে

বসবাস করলেও তাদের বিয়ে হয় নি তখনও। কিন্তু ন্যান্সিকে ফাঁকি দিয়ে তিনি মারিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এরিকসন লিখেছেন, আমি ন্যান্সিকে ঠকাচ্ছি। এতে আমার কোনো অনুশোচনা ছিল না। আসলে ন্যান্সি নয়, ভীষণ ভালোবেসেছিলাম (বাঙালী মেয়ে) মারিয়াকেই। ন্যান্সিকে কীভাবে তার স্বামীর কাছ থেকে ছিনতাই করেছিলেন এরিকসন সে সম্পর্কে লিখেছেন,

১৯৯৭ সালের শরৎকাল। আমি ইতালিয়ান একটি স্পাতে রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। তখন আমার সঙ্গী এক নারী। তিনি সবে সুইডেন থেকে আমাকে দেখতে এসেছেন। সহসা আমাদের টেবিলের দিকে এক নারী ও এক পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। মহিলাটি ছিলেন শ্যামলা। তবে অনেক সুন্দরী। অন্য যেসব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই ওই নারীকে দেখতে লাগলেন। তারা বিস্ময়ে বললেন, ওয়াও! তার সঙ্গের পুরুষটি নিজেকে পরিচয় দিলেন গিয়ানকারলো হিসেবে। তিনি রোমা ফুটবল দলের ফ্যান বলে পরিচয় দিলেন। এই দলটির এক সময় ম্যানেজার ছিলাম আমি। পরে রোমার প্রতিপক্ষ দলের ম্যানেজার হই। অল্প সময়ের মধ্যে তাকে দেখে অতি শান্ত মানুষ মনে হলো। কিন্তু আমি তো তার সঙ্গী নারীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না।

তিনি গিয়ানকারলোর স্ত্রী ন্যান্সি ডেলওলিও। তখন তার চেহারা, অভিব্যক্তি এমন ছিল যে, তার দিকে চোখ না দিয়ে পারা যায় না। আমরা কিছু সময় বসে গল্প করলাম। এর পরের দিন ওই দম্পতির সঙ্গে আমার আবার দেখা। এবার একটি সুইমিং পুলে। ন্যান্সি

আমাকে তাদের রোমের বাসায় নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তা গ্রহণ করলাম। বললাম, তাহলে তো চমৎকার হয়। তার স্বামী গিয়ানকারলো একজন আইনজীবী। তিনি রোমের বিলাসবহুল এক বাসায় বসে আইনী কাজ করেন। এতে তিনি সফল। তার স্ত্রী ন্যান্সিও একজন আইনজীবী। কিন্তু তিনি তেমন আইনচর্চা করেন না।

আমরা যখন নৈশভোজের টেবিলে তখন আমার পাশের চেয়ারে বসলেন ন্যান্সি। আমাকে এরপর একের পর এক অনেক দিন নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। প্রতিবারই আমার চেয়ারের পাশে বসেন তিনি। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি। এদিন আমার বয়স ৫০ হলো। বেলা ব্লু নামে একটি রেস্তরাঁ ও নাইটক্লাবে একটি পার্টি দিয়ে তা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হলো ৬০ জনকে। তাদের মধ্যে ছিলেন ন্যান্সি এবং তার স্বামী গিয়ানকারলো।

এরিকসন আরও লিখেছেন, তখনও আমি সিঙ্গেল। এর আগেই আমার ইতালিয়ান সুন্দরী গ্রেজিলা মানসিনেলির সঙ্গে প্রেম জমে ওঠে। তখন আমি জেনোয়াতে একটি দলের ম্যানেজার। গ্রোজলার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে আমার বিয়ে ভেঙে যায়। রোমের ওই জন্মদিনের পার্টি শেষে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমি কিছু পানীয় পান করতে গেলাম। তখন আমার সঙ্গে আমার সাবেক স্ত্রী অংকি। এসব বন্ধুর মধ্যে ছিল সে-ও। এক পর্যায়ে কথায় কথায় উঠে আসে ন্যান্সি প্রসঙ্গ। ন্যান্সি শুধু আমাকেই চমকে দেয় নি, সে সবাইকে যেন

মোহময় করে ফেলেছিল। আমার স্ত্রী অংকি বললো, এরই মধ্যে যদি এরিকসনের বিছানায় ন্যান্সি না গিয়ে থাকে তাহলে খুব শিগগিরই যাবে। তাদের সম্পর্ক এ পর্যন্ত গড়াবে। আসলেই তার পূর্বাভাস সত্যি হয়েছিল।

পাঠক! আপনি চিন্তা করুন, কত খোলামেলাভাবে একজন বৃদ্ধ তার অনাচার ব্যক্তি জীবনের কথা অকপটে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আরও লজ্জা ও বেদনার বিষয় হচ্ছে, একজন বাঙালী মুসলিম নারী কীভাবে তার কামনার শিকার হয়ে সেই নোংরা কাজে গৌরব ও শিহরণের অনুভূতি প্রকাশ করছেন!

তসলিমার সাক্ষাতকারটিই কথাই চিন্তা করুন। জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে হয়ত কিছুটা অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু তবু থেমে নেই তার অনুভূতির অশ্লীলতা। কত গড় গড় করে বলে দিলেন নিজের বহুগামতার কথা, কত পুরুষের সঙ্গে শুয়েছেন, কার সঙ্গে কীভাবে মিলিত হয়েছেন তা দ্ব্যর্থ ও ভাবলেশহীন বাক্যে তুলে ধরেছেন! আজ আধুনিক সভ্যতায় এই যে একজন নারী তার পতিতাবৃত্তির কেচ্ছা প্রচার করছেন প্রবল বিক্রমে তা কি জাহেলী যুগের মানুষ কল্পনা করতে পারত? এসবের বিবেচনায় ইমরুল কায়েস ও তৎকালীন লেখক-কবিদের ‘অশ্লীল’ কাব্য-কবিতা ও তাদের ব্যক্তি-জীবনের প্রকাশ আজকের তুলনায় অনেক শালীন, মার্জিত ও অভদ্রতার ক্ষমাযোগ্য সীমানায় আবদ্ধ।

খারাপ মানুষ সব যুগেই থাকে এবং আগেও ছিল। সুতরাং যুগের বিচার হয় না, বিচার হয় যুগের বাসিন্দার, যারা নগ্নতা, অশ্লীলতা

এবং অশ্লীলতার বিকাশ ও প্রকাশকে সাধারণ বিষয়ে পরিণত করেছে। নিঃসন্দেহে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই একমত হতে বাধ্য যে, আমরা জাহেলিয়াতকে নিজেদের সামনে রাখতে দিইনি, প্রবল প্রতিযোগিতা ও তীব্র লড়াই করে অনেক দূরে ফেলে এসেছি! এখন সময় সামনে এগোবার, অশ্লীলতা, নোংরামী, পাপাচারে পৃথিবীর সব জাতি, শ্রেণি এবং পশু-প্রাণীকেও হার মানাবার!!!

'আলফু লাইলা ও লায়লা' (One Thousand and One Nights একহাজার এক রজনী) বা বিকৃত বাংলার 'আলিফ লায়লা' গ্রন্থে 'জাহশিয়ারী' এক হাজার একটি গল্প লেখার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু মাঝপথে ৪৮০টি গল্প লিখেই সে ইচ্ছার চাদর ভাজ করে রাখতে হয়েছিল। হাজার রজনীর গল্প ফুরিয়ে যায় কিন্তু ফুরায় না আমাদের নারী-লাঞ্ছনার কাহিনী। বন্ধ হয় না জাহিলী সভ্যতার পুনরাবৃত্তি। তাই জাহেলিয়াতের সব স্তর অতিক্রম করা আরো কিছু গল্প শুনুন। বিচার করুন নিজ বিবেচনাবোধে এবং নির্ধারণ করুন এই সমাজের নারী-ভাগ্য। আল্লাহর বাণী দিয়েই এ পর্বে ইতি টানা যাক :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ١٩ ﴾ [النور: ١٩]

'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' {সূরা আন-নূর, আয়াত : ১৯}

## আমরা নব্য জাহেলিয়াতের বাসিন্দা! কারণ-২

বাবা-মায়েরা বাধ্য করছেন!

﴿ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣ ﴾ [النور: ٣٣]

‘তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩৩}

আলোচ্য আয়াতে জাহেলী যুগের কতিপয় মুনাফেক সুবিধাবাদি লোকের স্বভাবের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরা নারীদের সতীত্ব বিক্রি করে নিজেদের আখের গোছাতো এবং সমাজকে করত কলুষিত। এই নারী-ব্যবসায়ীদের অন্যতম হোতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। সে অন্য ধর্মাবলম্বী নারী তো বটেই, মুআজা নাম্নী এক মুসলিম দাসীকেও ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থোপার্জন করত। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, মুনাফিক আব্দুল্লাহর মোট ছয়জন দাসী ছিল। মুআজা, মুসায়কা, উমায়মা, আমরাহ, আরওয়া এবং কুতায়লা। একদিন এদের একজন এক দিরহাম উপার্জন করে নিয়ে এলো এবং অপরজন আনল সামান্য কিছু অর্থ। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় তাকে আবার ওই কাজে লিপ্ত হয়ে সমপরিমাণ দিনার নিয়ে আসার আদেশ করল। কিন্তু ওই দাসী প্রতিবাদ করে বলল,

অসম্ভব! আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে এবং ইসলাম এই জঘন্য কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। সুতরাং আমার দ্বারা এটা আর সম্ভব নয়।'

ইবনে জারির রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ

'এরা ছিল নির্দিষ্ট কিছু নারী। কতিপয় গরীব মুসলিম এদের বিয়ে করতে লাগলেন, যাতে এরা (নিজেদের) উপার্জন স্বামীদের পেছনে ব্যয় করে। আয়াতে আল্লাহ তাদের এহেন অভিসন্ধি থেকে নিষেধ করে দেন।' [তাবারী, জামেউল বায়ান : ১৭/১৫০]

প্রাচীনত্বের সূত্র ধরেই নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ পণ্যের মতোই এই অবলা নারীকে ব্যবসার পণ্য বানাতে অনেকেই সেজেছে মহাজন। এই মহাজনদের অর্থলিপ্সায় পুড়ে ছাড়খার হচ্ছে নারীত্বের মর্যাদা, ভূলণ্ঠিত হচ্ছে নারীর সবচেয়ে সর্বদামী 'সতীত্ব'। সভ্যতার লগি-বৈঠা ঠেলে আধুনিকতার যে মহাতরী আমরা তথাকথিত সভ্যতার নদীবন্দরে ভিড়িয়েছি, তার রং-রূপ যে কত কদর্য তা কল্পনাও করা মুশকিল।

'অশ্লীলতার অভিযোগে চলচ্চিত্র জগতের বেশ ক'জন অভিনেত্রী অভিযুক্ত। অভিযোগ রয়েছে আয়ের কোনো পথ না থাকায় মায়েরাই জোর করে মেয়েদের এ পথে ঠেলে দিচ্ছেন। নায়িকা ময়ূরীর মা

সেতু ইসলাম বলেন, আমার মেয়ে অশ্লীল নায়িকা নয়। সে কখনও অশ্লীল চরিত্রে অভিনয় করেনি। নির্মাতারা ডামি ব্যবহার করে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে।’

তিনি বলেন, আমার মেয়ের নামের সঙ্গে অশ্লীল বিশেষণ শুনতে কষ্ট লাগে। ওর আসল নাম মুনমুন আক্তার লিজা। ১৯৯৭ সালে চলচ্ছিত্র নির্মাতা মালেক আফসারী আমাকে বললেন, আপনার মেয়েকে চলচ্চিত্রে নিতে চাই। আমি বললাম অভিনয় তো আমি করি। আমার মেয়েকে চলচ্চিত্রে কাজ করানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। তিনি জোর দিয়ে বললেন, রোজী আফসারী অপেক্ষা করছেন। ওকে নিয়ে চলেন। সে তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। বারো বছর সাত মাস বয়স। আমি আবারো বললাম, আমার মেয়ে এখনও ছোটো। তাকে চলচ্চিত্রে দেব না। শেষ পর্যন্ত জোর করে রোজী ভাবীর কাছে নিয়ে গেলো আমাদের। রোজী ভাবী ওকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, আমাদের ঘরে এত সুন্দর মেয়ে থাকতে বাইরে নায়িকা খুঁজছি কেন? তাদের জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম।

আফসারী ভাই আমার হাতে ৫০ হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে ছবিতে নাম লেখান। নাম মৃত্যুর মুখে। তারপর সে নিয়মিত ছবি করে যেতে লাগল। বেশ সুনামও অর্জন করল। এক সময় শুনলাম সে নাকি অশ্লীল ছবি করছে। বিষয়টি তার মুখ থেকেই শুনতে চাইলাম। ও বলল, নির্মাতা বলেছে, গল্পের প্রয়োজনে শর্ট ড্রেস পরতে হবে। কিন্তু ছবিতে যেভাবে খোলামেলা দেখানো হয়েছে ওরকম শট দেইনি।

পরে জানতে পারলাম, প্রযোজক-পরিচালক অন্য মেয়ে দিয়ে খোলামেলা শট নিয়ে তাতে ময়ূরীর মুখ লাগিয়ে চালিয়ে দিয়েছে!

ময়ূরীর মা আরো বলেন, বিশ্ব আধুনিক হয়েছে। সবকিছু উন্মুক্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের নায়িকারা গল্পের প্রয়োজনে পাতলা বা ছোট কাপড় না পরলে তাকে নিয়ে নির্মাতারা কাজ করবেন কেন? তিনি বলেন, দর্শক সাটেলাইট চ্যানেল, ডিভিডি, সিডি কিংবা প্রেক্ষাগৃহে বিদেশি ছবি এবং নীল ছবি অহরহ দেখছে। তাহলে এদেশের নায়িকাদের দেখতে অভ্যস্ত নয় কেন? তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের চোখ পাল্টেছে কিন্তু মন পাল্টায়নি।

সেতু ইসলামের প্রথম কথাগুলো ভালোই ছিল। তিনি হয়ত নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে অসমীচীন মনে করে মেয়েকে এই নষ্টপথে না দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে সঠিক পথেই এগুচ্ছিলেন। কিন্তু অপরের পীড়াপীড়ি আর নিজের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা অস্পষ্ট ইচ্ছার কাছে হার মেনেছেন এবং পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকায় প্রলুব্ধ হয়ে মেয়েকে চির অকল্যাণের পথে নামিয়েছেন। শুধু কি তাই! নিজ মেয়ে ও এদেশের অন্য মুসলিম নারীদেরও তিনি প্রলুব্ধ করছেন সংক্ষিপ্ত বসন-ভূষণে নিজেদেরকে উপস্থাপিত করতে। আক্ষেপ করছেন এই সমাজ কেন পশ্চিমাদের অনুকরণে এখনও অশ্লীলতার সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না! অশ্লীলতার অন্য যাবতীয় উপকরণ অনুসরণ করে প্রেক্ষাগৃহগুলোতেও নগ্নতার বিস্তৃতি ঘটছে না সেজন্য!

এই ভুলোপথের মায়েরা কি বোঝেন না, এদেশের তরুণ প্রজন্মই কেবল প্রেক্ষাগৃহগুলোকে ভীড় জমায় না; অনেক শিশুরাও ভীড় করে

এখানে? সুতরাং এমনিতেই এই শিশুগুলো চোখ খোলার আগেই বদদীনী রপ্ত করছে। শিখছে অশ্লীলতা। এর মধ্যে যদি নগ্নতার মহড়া চলে এবং পশ্চিমাদের অনুসরণে এদেশের মুসলিম নারীদেরকে বিবসনা উপস্থাপনা করা হয় তবে এদেশের মুসলিমসত্তাই শুধু হুমকির মুখে পড়বে তাই নয়; দেশের ভবিষ্যতও অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। কেননা অশ্লীলতায় নিমগ্ন একটা জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না কিংবা বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

সেতু ইসলামের এই কথাগুলো বুকের ভেতর কেমন শক্তভাবে বিঁধে। একজন মুসলিম নারীর নিজকন্যাদের ব্যাপারে এই মন্তব্য তা ভাবতেই কষ্ট হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকেও যেন তিনি ছাড়িয়ে গেছেন। উবাই তো পরকন্যাদের এই পথে নামিয়ে পয়সা কামাতেন, কিন্তু এই মায়েরা যে নিজকন্যাকে এই পথে নামিয়েছেন!

এবার সভ্যতার তীর তরীটা ভারতভূমে নিয়ে যাই। ভারতভূমির নৈতিক অবক্ষয় বর্তমানে পৃথিবীর সব ইতিহাস ও অবক্ষয়কে ছাড়িয়ে গেছে। এরা চলিচ্চত্র ও হিন্দুস্তানী ললনাদের উদ্বাহু নৃত্যকৌশলে বিশ্ববাজার দখল করতে গিয়ে নিজেদের লজ্জার বাঁধন একেবারেই ঢিলে করে দিয়েছে। তাই ঘটছে জঘন্য সব ঘটনা, ইতিহাসের কালি যার বিভৎসরূপ নিরূপণ করতে ব্যর্থ। এই বিভৎসতা ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের অস্তিমজ্জায়।

বিশ্বের যুবসম্প্রদায়কে ভ্রষ্ট করতে গিয়ে ভ্রষ্টতার মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে এদেশের প্রায় প্রতিটি নাগরিক। এদেশের চরিত্র ও নিষ্কলুষতা

বলতে এখন আর তেমন কিছু বাকি নেই। কিছুদিন আগে খবর বেরুলো, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় কেরালা রাজ্যে নিজের ১৭ বছর বয়সী মেয়েকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে! এমনকি অর্থের বিনিময়ে দুই শতাধিক পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে তার বাবা তাকে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ করেছে ওই মেয়ে নিজেই। গণমাধ্যমের কাছে নিজেই চরিত্রের এই অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছে মেয়েটি। এমনকি তার বাবা কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ারও অভিযোগ করেছে সে। এছাড়া তাকে না খাইয়ে রাখা হতো এবং অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে পাপকাজ করতে বাধ্য করা হতো বলে মেয়েটি জানায়।

মেয়েটি তার সঙ্গে যারা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে বলে নাম প্রকাশ করেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ঠিকাদার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পুলিশ সদস্যও রয়েছে। একটি স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলকে মেয়েটি বলে, 'বাসায় মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রথমে আমার বাবা আমাকে লাঞ্ছিত করে!'

এরপর আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাবো এ কথা বলে তিনি আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতেন।' ওই মেয়ে জানায়, যখন তার মা বিষয়টি বুঝতে পারে, তখন তাকে চুপ থাকার জন্য তার বাবা পরিবারের সব সদস্যকে হত্যার হুমকি দেয়। এই মেয়েটি দুই শতাধিক পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। যেটা আপনার বিবেককে দংশিত ও স্তব্ধ করে দেবে।

এই হলো সভ্য যুগের বাবা! বেচারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এরচেয়ে ঢের বেশি ভালো ছিল। সে নিজের মেয়েকে নোংরামীতে নামায়নি কিংবা নিজের মেয়ের সঙ্গে...

এশিয়া মহাদেশ জুড়ে দাদাগিরির দাম্ভিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীতার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠা ভারত একটা জলজ্যান্ত ধর্ষণের খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে। যার কারণে এখানে পিতৃত্ব পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে ঘটছে এধরনের আরো ভয়াবহ ঘটনা। পৃথিবীতে একজন সন্তানের সবচেয়ে বড় আশ্রয় আর কী হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হলে উত্তর খোঁজার জন্য খুব বেশি সময় নিতে হতো না আগে। এক মুহূর্তের ব্যবধানেই উত্তর আসতো পিতা-মাতা। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এই বিশ্বাস প্রবহমান ছিল। কিন্তু ভারতের নানান ঘটনা আবহমানকাল ধরে চলে আসা এই বিশ্বাসের ভিত্তিকে খুবই নড়বড়ে করে দিয়েছে।

কারণ এই আশ্রয় ভয়ঙ্কর কদর্য মনোবৃত্তির তাড়নার দাবানলে ভেঙ্গে পড়ে তা এখন বিস্ময়, অবিশ্বাস, হতাশা আর ঘৃণার স্থানে পরিণত হয়েছে। যে পিতা সন্তানের প্রথম ও শেষ আশ্রয়, যে পিতা সন্তানকে আগলে রাখেন সব অশুভ পরিণতি থেকে, সেই পিতা নামধারী কতক পাষণ্ডই ধর্ষণ করে চলেছে তার কিশোরী কন্যাকে, অতঃপর হত্যাও!

এধরনের আরেকটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে ভারতের মুম্বাইয়ের শহরতলীতে। উত্তর প্রদেশে থেকে আসা ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে তারই পিতা ও পিতার এক বন্ধু। গ্রেফারের পর দুই পাষণ্ডই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর প্রদেশের গাজিপুরের নিজ গ্রাম থেকে বিয়ের উদ্দেশে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে মুম্বাই চলে আসে কিশোরীটি। এখানে এসে বন্ধুর সঙ্গে যে বাসায় কিশোরীটি বসবাস করছিল সেখানে এক বন্ধুসহ তার বাবা এসে উপস্থিত হয়। বুঝিয়ে-শুনিয়ে মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি।

কিন্তু মেয়েটি রাজি না হওয়ায় তার বাবা জোর করে কন্যাটিকে কাছের একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে বন্ধুসহ নিজ কন্যাকে ধর্ষণ করে পাষণ্ড পিতা। আর এ ঘটনার পরপরই মেয়েটি ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।

দেশ-বিদেশের সব ঘটনার নির্মমতা ছাড়িয়ে গেছে খোদ আমাদের দেশের একটি ঘটনা। ঘটনাটি হচ্ছে; ডাক্তার বানানোর কথা বলে অন্তু নামের আপন ছোট বোনকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করিয়েছে তারই বড় বোন মাফিয়া। এমনই তথ্য বেরিয়ে আসে একুশে টেলিভিশনের একটি অনুসন্ধানি রিপোর্টে। বার বছর বয়সী অন্তু জানিয়েছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিন ধরে তাকে এমন জঘণ্য কাজ করিয়ে যাচ্ছে তার বড় বোন মাফিয়া। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর মালিবাগে। তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে। একুশে টেলিভিশনের ৭ নভেম্বর ২০১৩ ইং প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

বড় হয়ে ডাক্তার হবে, মানুষের সেবা করবে, পরিবারের অভাব ঘোচাবে, এমন হাজারো স্বপ্ন নিয়ে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় বড় বোনের কাছে এসেছিলো অন্তু। কিন্তু আসার পর থেকে তাকে দিয়ে জোরপূর্বক শরীর-ব্যবসা করাতে থাকে তারই আপন বড় বোন।

গোপনীয়ভাবে এমন তথ্য জানার পর একুশে টেলিভিশন ওই বাসায় উপস্থিত হলে অন্তুর বড়বোন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু একপর্যায়ে মাফিয়া তার অপকর্মের কথা অকপটে স্বীকার করে। সে জানায়, তার ছোটবোনের পড়ালেখার খরচ জোটাতে এ লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও।

এদিকে অন্তুর মা জানিয়েছে, তার বড় মেয়ে পড়ালেখার কথা বলেই অন্তুকে ঢাকায় নিয়ে গেছে। কিন্তু এরপর কি হয়েছে তা সে জানে না। নিজের মেয়ের কাছেই যখন মেয়ের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সে এখন কার কাছে যাবে এটাই এখন পরিবারটির জিজ্ঞাসা।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী রক্সি ফাতেমা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, 'মানুষ মনে করে তার নিরাপত্তার সর্বশেষ আশ্রয় হলো নিজের পরিবার। কিন্তু নিজ পরিবারেরই কেউ যখন তাকে এরকম জঘন্য অপকর্মের দিকে ঠেলে দেয়, তখন মানুষের নিরাপত্তার স্থান কোথায়?'

সায়মা আক্তার একজন গৃহিনী। তিনি জানান, 'বড় বোনরা সাধারণত মায়ের মতোই হয়ে থাকে। সেই বোন যখন বোনকে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করে, তাহলে সেটাকে মানবতার বিপর্যয়ই বলা চলে।'

এভাবেই কন্যা বাবার কাছে, ছোটো বোন বড় বোনের কাছে, মেয়ে মায়ের কাছে অপরিচিত ও অনিরাপদ হয়ে উঠছে। এসব ঘটনায় বারবার একটা প্রশ্ন নাড়া দিচ্ছে, যে সমাজের পিতা তার কন্যার, বড়বোন তার ছোটোবোনের এবং মা তার মেয়ের ইজ্জত দিতে পারে না, আব্রু রক্ষার জামিন হতে পারে না সেই সমাজে অন্যরা কেন

দেবে নারীর দাম, নারীর মর্যাদা? নারীর জন্য একই সঙ্গে করুণা ও আক্ষেপ যে, তারা তাদের সতীত্ব-সম্ভ্রমের ব্যাপারে সবদিক থেকেই অনিরাপদ হয়ে উঠছে।

**মায়ের উৎসাহে স্কুল পড়ুয়া মেয়ে এখন অন্তঃসত্ত্বা!**

পাঠকগণ প্রশ্ন করতে পারেন, আলোচ্য গ্রন্থে বিধর্মীদের আলোচনা স্থান দেয়ার যৌক্তিকতা কী? এর বিজ্ঞোচিত যৌক্তিক কারণ পেশ করতে পারব না। তবে এতটুকু তো সত্য যে, এরাও সমাজেরও একটি অংশ, বরং বলা যায় এরাই পরিবর্তিত বিশ্বের নিয়ন্ত্রক। আর বিশ্ব ইতিহাসের অলিখিত সংবিধান হচ্ছে, নিয়ন্ত্রিতরা নিয়ন্ত্রকদের অনুগামী ও অনুসারী হয়। নির্মল হাওয়া খাওয়ার জন্য যিনি ঘরের দখিনা জানালা খোলা রাখেন, তিনিই আবার নর্দমার দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত বাতাস থেকে বাঁচতে উত্তরের জানালা বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু যে শুধু উত্তরের নোংরা বাতাসের খবরই রাখেন তিনি যেমন নির্মল বায়ু থেকে বঞ্চিত হন, তেমনিভাবে যে শুধু দখিনা নির্মল বায়ুর সন্ধান রাখেন তিনি উত্তরের নোংরা হাওয়ায় আক্রান্ত হন। সুতরাং বুদ্ধিমান তিনিই, যিনি ভালোকে ভালো জেনে তা গ্রহণ করেন এবং মন্দকে মন্দ জেনে তা বর্জন করেন।

তাই আমাদের হৃদয় জানালা দিয়ে যেন কেবলই ভালো ও অনুসরণীয় বস্তুটাই প্রবেশ করে, মন্দ ও নোংরা বস্তুটা প্রবেশ না করে সেজন্য আমাদের সচেতন হওয়া চাই। বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার কোনটা নির্মল ও সেবনযোগ্য বায়ু এবং কোনটা বর্জনযোগ্য তা জানা থাকা একান্ত অপরিহার্য। এই ভাবনা থেকেই বিশ্বের নানাপ্রান্তে

ঘটমান এসব ঘটনা উল্লেখ করে আমরা নিজেদেরকে সতর্ক করতে চাই এবং আমরা যাদের অনুসরণ করছি তারা প্রকৃতপক্ষেই অনুসরণযোগ্য কিনা সেটা বিবেচনার জন্যই এসব ঘটনা পাঠকদের বিবেকের কাঠগড়ায় পেশ করা হয়।

বস্তুতঃ এদের কালচার, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকলে ভ্রান্তপথে পা বাড়াবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শঙ্কা আছে বিবেকের আদালতের ভ্রান্ত ফয়সালা দেয়ার। ভয় আছে ভুল পথে চলার এবং অন্যকে চালাবার। ভূমিকা বড় করে বলে ফেললাম। এবার আগের কথায় ফিরে আসি...

সন্তানের মা হতে যাচ্ছে সয়া কিভেনি নামে এক স্কুল পড়ুয়া মেয়ে। তাকে নিয়ে সমাজের অন্য অভিভাবকরা নাক কুঁচকালেও তার মা জেনিস কিভেনির আনন্দের শেষ নেই। তিনিই মেয়েকে এতটুকু পথ নিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছেন। মেয়েকে মাত্র ১২ বছর বয়সে বিকিনি পরা ছবি তোলার উৎসাহ দিয়েছেন। তা ছাপা হয়েছে একটি ম্যাগাজিনে। আর তারপর সয়া কিভেনিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে তাকে ডিসকো পার্টিতে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এখন সয়া কিভেনির বয়ফ্রেন্ড জ্যাককে মেয়ের সঙ্গে রাত কাটানোর অবাধ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন। সয়াদের বাড়িতেই রাতে থাকে এখন জ্যাক। এরই ফল হিসেবে সয়া কিভেনি এখন ১২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। এ নিয়ে অনেকজন অনেক কথা বলছেন। তাতে কান দিচ্ছেন না সয়া কিভেনির মা জেনিস। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য সান। এতে বলা হয়, সয়া কিভেনির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার

খবর জানতে পেরে তার মা জেনিসের আর গর্ব ধরছে না। তিনি আহ্লাদে একেবারে গদগদ।

আর তাই বলছেন, আমাদের তিন বেডরুমের বাসাটি এখন লোকসংখ্যার তুলনায় একেবারে ছোট হয়ে গেছে। একই বাড়িতে থাকে আমার মেয়ে কোকো ও রিজি, ছেলে ট্যারোট, সয়ার বয়ফ্রেন্ড জ্যাক এবং আমার এক মেয়ের শিশু সন্তান। আমার আশা, সয়ার সন্তান যখন আসবে তখন কাউন্সিল আমাদেরকে ৪ বা ৫ বেডরুমের একটি বাসা দেবে। আমরা এরই মধ্যে সবকিছু গোছগাছ শুরু করেছি। সয়া গর্ভপাতে বিশ্বাসী নয়। সে যে মা হচ্ছে এটা শতভাগ নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস সে চমৎকার একজন মা হবে। সে নিজের সন্তানদের শিখাবে আমার মতো শৃঙ্খলাবোধ! ওদিকে সন্তান ধারণ করতে পেরে সয়া কিভেনিও কম উৎফুল্ল নয়। সে বলেছে, প্রথমে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। তবে এখন আমি খুব উপভোগ করছি বিষয়টা!

ওই রিপোর্টে বলা হয়, সয়া কিভেনির মা জেনিস তার মেয়ের স্বপ্ন পূরণে দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ সহায়তা। তাকে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করিয়েছেন। পরিণত বয়স না হলেও তাকে পাঠানো হয়েছে শরীর চর্চার কেন্দ্রে। ওদিকে সয়া কিভেনির যেসব বিকিনি পরা ছবি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এক অভিভাবক বলেছেন, আমাদের মনে হয় তার মায়ের এভাবে মেয়েকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হয়নি। তিনি কি কিশোরী মেয়ে শিকারীদের নাম শোনেননি? জেনিস এক স্কুলের সাবেক

সেক্রেটারি। এখন অবসরভাতা পান। তিনি সয়া কিভেনিকে ক্লিভল্যান্ডের থর্নাবিতে মাত্র ৭ বছর বয়সে ডিসকোতে যেতে দিতেন। তাকে মেকাপ করাতেন। পরাতেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোশাক। শরীরের উপরের অংশের অনেকটাই থাকতো অনাবৃত। জেনিস বলেন, সয়া এখনও মাত্র কিশোরী। অনেকটা অপরিণত। কিন্তু যখন সে তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যায় তখন তার ওপর আমার শতভাগ আস্থা আছে। তার ১২ বা ১৩ বছর বয়সে সে একটা ১৮ বছরের কম বয়সীদের ডিসকোতে গিয়েছিল।

জেনিস স্বীকার করেছে, সে সয়া কিভেনির বয়ফ্রেন্ড জ্যাককে তার বাসায় রাতে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। তবে সয়া ও সে আলাদা আলাদা বেডরুমে থাকতো এবং ওই সময়ে সয়া ব্যবহার করতো পিল। সয়া এখন ১২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। এই সময়ে তিনি তাদের আলাদাই রাখতে চান। তিনি বলেন, লোকজন মনে করতে পারে আমি ঘোড়ার আগে গাড়ি চালিয়ে আইন লঙ্ঘন করছি। কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি জানুয়ারিতে সয়ার বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হবে। এর আগে তাকে ও জ্যাককে আমার বাসায় এক বেডরুমে থাকতে দেব না।

আমি শুরু করেছিলাম কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে। যে আয়াতে মানুষের নৈতিক অধপতনের চূড়ান্ত অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি কয়েকটি তাফসীর ও হাদীসের কিতাবের উদ্বৃতি সেই সময়ের করুণ অবস্থা ও নৈতিক ভঙ্গুরতার চিত্র তুলে ধরেছি। আশা করি বিচক্ষণ পাঠক এ দুই সময়কার পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম

হবেন। জাহেলিয়াতের ওই ঘোরতর অমানিশাতেও কিন্তু কোনো পিতা তার কন্যাকে ব্যভিচারে বাধ্য করেছে বলে কোনো ঘটনা আমরা জানি না। কিংবা ব্যভিচারের ফসল অবৈধ সন্তানে উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কোনো ইতিহাসও সংরক্ষিত নেই। সয়া কিভেনির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানতে পেরে তার মা জেনিসের আর গর্ব ধরছে না। সে আহ্লাদে একেবারে গদগদ। উদ্বেলিত আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সে বলেছে, 'আমরা এরই মধ্যে সবকিছু গোছগাছ শুরু করেছি। সয়া গর্ভপাতে বিশ্বাসী নয়। সে যে মা হচ্ছে এটা শতভাগ নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস সে চমৎকার একজন মা হবে। সে নিজের সন্তানদের শিখাবে আমার মতো শৃঙ্খলাবোধ!'

ওদিকে সন্তান ধারণ করতে পেরে সয়া কিভেনিও কম উৎফুল্ল নয়। সে বলেছে, 'প্রথমে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। তবে এখন আমি খুব উপভোগ করছি বিষয়টা!' একটা অবৈধ সম্পর্কের অবৈধ সন্তানকে গ্রহণ করতে যে সমাজ এত উদ্বেলিত থাকে সেই সমাজে বৈধতার কোনো মূল্য আছে কি? যে সমাজে ব্যভিচার ঘৃণিত তো নয়ই, বরং উপভোগের বস্তু সেই সমাজকে মনুষ্যত্বের কাতারে রাখার চেষ্টা নিজেদের সততাকে চরমভাবে লঙ্ঘিত করার নামান্তর। মানুষ আজ এতটুকু পারে? আসলে বিজ্ঞানের যুগে এসে সবকিছুর হিসাব-নিকাষ বদলে গেছে। বিজ্ঞান যেমন মানুষকে হাজার রকমের থমকে দেয়া বিস্ময় বস্তু উপহার দিয়েছে তেমনিভাবে মানুষও বিজ্ঞানের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ঘটাচ্ছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর নানান ঘটনা। এসব ঘটনায় কেঁদে উঠছে মানবতার শুদ্ধপ্রাণ, নির্মলতা হারাচ্ছে সভ্যতার তাজা

ফুল। পক্ষান্তরে অট্টহাসিতে মেতে উঠছে বর্বরতা, অসভ্যতার ভূতুড়ে দাঁত। কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠছে যে বিষয় সেটা হচ্ছে, আমরা মানবতার নির্মল ফুলের নির্জীবতায় বিষণ্ন হচ্ছি না; অসভ্যতার ভূতুড়ে হাসিতে ফেটে পড়ছি! এ হাসি সভ্যতার উপহার! বিজ্ঞানের দান!! উৎকর্ষের সুফল!!!

## ‘প্রতিবেশির’ নির্লজ্জতায় অনলে গা পোড়ে প্রতিবেশির

আকাশ-সংস্কৃতি কি আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে? নৈতিকতাভিত্তিক যে চরিত্র গঠনের আবেদন আমরা জানাই, যে আন্দোলন করি, যে অনুশীলন আমরা সাধ্যমত করছি, এই চরিত্রের সঙ্গে আকাশ সংস্কৃতি কি সাংঘর্ষিক, না সহযোগী?

আকাশ-সংস্কৃতি কী? আকাশের তো কোনো সংস্কৃতি পয়দা হয় না। তবে হ্যাঁ আকাশ পথে সব সংস্কৃতির বেসাতি চলে, আমদানি-রপ্তানি হয়, ক্রয়-বিক্রয় হয় তাই টোটাল সওদাকে আমরা বলতে পারি আকশ-সংস্কৃতি। আপনি আমি এটাকে সংস্কৃতি বলি আর নাই বলি, বাজারে এটাই সংস্কৃতি নামে পরিচিত। আকাশ থেকে এ পর্যন্ত একটি তারকাও খসে পড়েনি, তবুও সিনেমা জগতে, ফুটবল জগতে, ক্রিকেট জগতে, এমনকি পরীক্ষার ফলাফল সিটে হাজার হাজার তারকার ভীড়। এসবের কোন কোনটির পেছনেও আকাশ-সংস্কৃতির ভূমিকা রয়েছে।

আকাশ-সংস্কৃতির কারবারটা জানতে হলে কি আকাশ ঘুরে আসতে হয়? আসলে আকাশের ঠিকানা আমরা জানি না, বিজ্ঞানীরাও জানে না। তবে আকাশের ঠিকানা জানা না জানার প্রশ্ন পরের কথা, দুনিয়া থেকে যদি আখেরাতের সওদা আহরণ করা যায়, তাহলে জমিনে বাস করে আকাশের খবর কেন জানা যাবে না? আকাশের আলোচনায় আসার আগে দুনিয়ার কিছু খবরাখবর আমাদের জানা দরকার। আকাশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের নিয়ত ও আত্মপরিচয় কী সে সম্পর্কে কিছু বলার ও জানার আছে। আল্লাহ

আমাদের কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তা জানা থাকা দরকার। এসব না জানলে, মনোবল সেভাবে গড়তে না পারলে এবং আকাশ শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার ঈমানী হিম্মত নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারলে আকাশ সংস্কৃতির ভাইরাসরা আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলবে। এখনই ঘেরাও এর মধ্যে আছি। এজন্য দুনিয়াতে আমাদের আগমন ও জীবনযাপন আর প্রস্থান সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। নিজেকে চিনলে, নিজেকে জানলে আল্লাহকে চেনা যায়, জানা যায়। এবং তখন যে কোনো যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায়।

আমরা দুনিয়াতে বাস করি। এই দুনিয়াতে আমাদের প্রেরণ কি স্রষ্টার নিছক খেয়ালমাত্র? আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]

‘তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?’ {সূরা আল-মু’মিনূন, আয়াত : ১১৫}

না তা নয়। খেলাচ্ছলে বা নিছক খেয়ালে আল্লাহ কিছুই করেন না। যদিও একক ক্ষমতা শুধু তারই আছে, হও বললেই হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾ [يس: ٨٢]

‘তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুকে তিনি যদি ‘হও’ বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়।’ {সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৮২}

এমন শক্তিধর সর্বশক্তিমান যিনি, তাঁর তো খলীফা প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তবুও তিনি মানবজাতিকে তার খলীফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির মধ্যে জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।' {সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬}

ইবাদত কী? ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে তার দেয়া জীবন বিধান অনুয়ায়ী জীবনযাপন করা। কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে এজন্য কওমের কাছে প্রতি জনপদে নবী-রাসূল এসেছেন। অনেকে তার আদেশ নিষেধ শুনেছে আবার অনেকে শুনেনি। প্রেরিত গাইডকে নির্যাতিত করেছে, গাইড বুকও ধ্বংস করেছে। তাই তাদের এখন নৈতিক কোনো বোধই নেই। যা ছিল তা অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে শেষ গেছে।

যে নৈতিকবোধ তারা নানাভাবে প্রদর্শন করে নিজেদের নীতিবান বলে বিশ্ববাসীর কাছে জাহির করছে, তা কৃত্রিম, নিজেদের মনগড়া নৈতিকতা। তারা-কাপড় পরিধান করেও থাকে দিগম্বর। সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করে বটে, সুন্দর সুন্দর সংলাপে শ্রোতাকে তারা মুগ্ধও করে। কারণ নৈতিকতার কুদরতী সীমানা আর মানুষের তৈরি সীমানার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কুদরতী হুকুমের কোনো তোয়াক্কা তারা করেনি। ফলে শয়তানের সঙ্গে মিতালী করে

এমন এক নৈতিকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, যা অনৈতিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা দিকে অবক্ষয়ের ঢল ও ধস। এমন এক পর্যায়ে অবক্ষয়ের সর্বশেষ স্তরে এবং সময়ের এই সন্ধিক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর মূল মিশন কী ছিল লক্ষ্যহীন ঠিকানাবিহীন এবং বিগত নবী-রাসূলদের শিক্ষা ও আদর্শ ভুলে যাওয়া মানবজাতির বংশধরদের বিস্মৃত সবক-পাঠ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সর্বক্ষেত্রে জাহিলিয়াতের যে অবক্ষয় নেমেছিল তা প্রতিহত করে চরিত্রবান জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ ٢٤ ﴾ [فاطر: ٢٤]

'আমি তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসেনি।' {সূরা ফাতির, আয়াত : ২৪}

সংস্কৃতি একটি জাতিকে প্রভাবিত করার অতুলনীয় মাধ্যম। তবে তার ব্যবহার হওয়া চাই যথার্থ। কেননা ব্যক্তি ও সত্তার প্রভাবে সংস্কৃতির ক্রিয়া ও প্রভাব ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে বাধ্য। সুতরাং বলা যায় নাস্তিক, মুরতাদ আর সেক্যুলারিস্টদের 'মূল্যবোধ, নৈতিকতা আর অবক্ষয়ের' সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তাওহীদে বিশ্বাসীদের সংজ্ঞা ব্যাখ্যার মিল নেই।

কোন পথে চললে কোন ঠিকানায় আমাকে পৌঁছাবে, কোন পথের বাঁকে বাঁকে এবং মোড়ে মোড়ে কে কে আছে এবং কেন আছে তাও

জানা হয়ে গেছে। অতএব নাস্তিকের নৈতিকতা ও সংস্কৃতি আমার জন্য অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতি হওয়ারই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

‘আকাশ সংস্কৃতি’ খুব লম্বা চওড়া বিষয় নয়, তবে এর আগে অথৈ আকাশ সংস্কৃতির সঙ্গে লড়াইয়ের আগে জেনে নিতে হবে আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত কি না, আমরা যে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবো তা লড়াই উপযোগী কিনা? আর এ লড়াইয়ের ব্যাপারে আমাদের ধ্যান-ধারণা পরিষ্কার কিনা। ধারণাটা পরিষ্কার করা হয় না বলে আমাদের অনেক আবেগী লোক জোশ ও জেদের বশবর্তী হয়ে পাল্টা কিছু করতে চান এবং কিছু কিছু করেও দেখেছেন। না ওকুল পেয়েছে না একুল পেয়েছেন। ওরা ফ্যাশন শো করে, আমরাও করে দেখি না আমাদের মতো করে! করে দেখা গেল বাজার পাওয়া গেল না!

মহিলাদের রূপ প্রদর্শনই যখন ইসলামে নিষিদ্ধ, তখন ফ্যাশন দেশটায় কীভাবে বাজার পায়? নিতান্ত সাংঘর্ষিক। ফ্যাশন শো ইসলাম বিলাসিতা মনে করে, তাও আবার নারীর ফ্যাশন, মানে পুরুষকে প্রদর্শন? এভাবে উদাহরণ দিলে অনেক দেয়া যায়। মিসরে একবার জামাল আব্দুন নাসেরের সময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নামে নৃত্য (নাউযুবিল্লাহ) বানানো যায় কিনা- এমন এক কসরত শুরু হয়েছিল, কিন্তু শুরুতেই এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সন্ত্রাসের পাল্টা সন্ত্রাস, বোমাবাজির পরিবর্তে বোমাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ আর খুনের বদলা ছিনতাই অপহরণ আর খুন, গালির বদলে গালি, ইসলাম তা কখনও সমর্থন করে না।

তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ন্যায়ের অস্ত্র বহুমুখী ব্যবহারের এস্তেমাল ইসলাম সমর্থন করে। এতটুকুই শুধু বলা যায়, এর অধিক বলার অবকাশ এখানে নেই। ওরা ক্রুসেডের ডাক দিলেও আমরা জিহাদের ডাক দিতে পারছি না নানাবিধ কারণে। কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্ন ধারণা, অস্পষ্টতা আর ভুল বোঝাবুঝি প্রচুর। ওদের এই আছে, হরেক রকম সংস্কৃতির উপকরণ আছে, তাদের মুকাবিলায় আমাদের কিছু থাকা দরকার। কিন্তু তাই বলে সবকিছুর জবাব একই ভাষায় দিতে হবে? ওদের সমাজে পিতৃপরিচয়হীন সন্তান কিলবিল করছে, লাখ লাখ সমকামীদের উৎপাদন চাই? আমরাও কি তবে সেই কালচারের পৃষ্ঠপোষকতা করব? অন্যের বাবা দেখতে যত সুন্দর হোক তাকে আমি বাবা বলি না, সাফ বিভাজন। আমার সংস্কৃতি আমার বটে। কিন্তু আমার ঈমানের বলয়ের বিপরীত বলয়ের সংস্কৃতি কখনোই আমার হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বাণীই আজ বাস্তবে পরিণত হতে দেখছি। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ»

'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী হবে। হাত হাত ও বিঘত বিঘত তথা হুবহু এবং অবিকলভাবে। এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তে ঢুকে পড়ে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রিস্টন? তিনি বললেন, তারা নয় তো আর কারা? [বুখারী : ৩৪৫৬; মুসলিম : ২৬৬৯]

যে বিজাতির অনুসরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

'যে কোনো জাতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে সে তাদের গোত্রভুক্ত বলেই গণ্য হবে।' [আবূ দাউদ, সুনান : ৪০৩১]

আমার কৃষ্টি বা কালচার বা সংস্কৃতির কী বুঝে তারা, এতে যাদের ঈমান ও বিশ্বাস নেই? ড. মরিস বুকাইলী বাদশাহ ফয়সালকে জানিয়েছিলেন আমি ইতিবাচক নিয়তেই বলছি, ইসলামের ওপর গবেষণা করবো। স্বল্পভাষী বাদশাহ ফয়সাল স্মিত হাসি দিয়ে বলেছিলেন খুব ভালো, তাই যদি করতে চান তাহলে আগে পবিত্র কুরআনকে কুরআনের ভাষায় পাঠ করতে শিখুন অর্থ বুঝুন আরবি ভাষা শিখুন। মুরিস বুকাইলি সে উপদেশ মতো পবিত্র কুরআন স্টাডি করেছিলেন এবং ইসলাম বুঝেছিলেন। এরই ফলে তিনি অমর কয়েকটি গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং আমার বলয়ের সংস্কৃতিও আমাকে লালন করতে হবে এবং অন্যকেও পারলে এই সংস্কৃতির বলয়ে আনতে হবে। কিন্তু আমি কখনই অন্যের সংস্কৃতি আমদানি করে নিজের ঘর নষ্ট করতে চাই না।

আসল কথা হলো, নিজেদের পরিচয়ের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। তাহলে আকাশ-সংস্কৃতির কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা বাছাই করা যাবে। আপনার আমার কাছে যদি ঈমানের চালনী না থাকে, ঈমানের নজর না থাকে, ঈমানের মনটা না থাকে তাহলে আকাশ-সংস্কৃতির ভালোমন্দ কিছুই পরখ করা যাবে না। যে দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি প্রবল সে দেহে সহজে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না। আকাশ-সংস্কৃতির যত ভয়ঙ্কর ভাইরাস আছে, এসব সংস্কৃতির অনিষ্টকারিতার প্রতিরোধে আমাদের সংস্কৃতি অক্ষম, যদি নিজস্ব সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে সে চেষ্টা সাধনা না থাকে। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কালচার আর সংস্কৃতি এক নয়, যা কালচার তা সংস্কৃতি নাও হতে পারে। হাঁটার কালচার একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের এক, কিন্তু দু'জনের প্রার্থনা ও ইবাদতের কালচার ও সংস্কৃতি এক নয়।

এক কথায় মুসলিমরা সব কালচারকে তাদের ঈমানী সংস্কারের কষ্টিপাথরে বাছাই করে যা গ্রহণ করে তা মুসলসমানদের সংস্কৃতি। সকল ধর্ম যেমন এক নয়, সকল ধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতিও এক নয়। প্রত্যেক ধর্মাম্বলবীদের কাছে সংস্কৃতি নির্ণয়ের কষ্টিপাথরও নেই। আর নেই বলেই যা চকমক করে ঝকমক করে, তাকেই সংস্কৃতির সোনা বলে। যেমন আশ্চর্য কিছু দেখলেই পূজোয় লেগে যায়, গাছ, বাঁশ, সাপ, পাথর, সূর্যকে এমনকি বট গাছকেও অলৌকিকতায় মণ্ডিত করে পূজো করে।

বর্তমানে আকাশ-সংস্কৃতির বড্ড জোর। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ এই সংস্কৃতির হাওয়ায় ভাসছে। তরুণরা আবেগে থরথর করে কাঁপছে। আকাশ-সংস্কৃতির সওদা সিডি ও ক্যাসেট আকারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দোকানে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এসব সওদার মূল্য অতি কম কিন্তু মুগ্ধ করার, সম্মোহিত করার আছর থাকে বেশি। ঘরে ঘরে টিভি ও অন্যান্য যন্ত্র প্রবেশ করছে। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন চ্যানেলের নাম প্রোগ্রাম রোজ ছাপা হয়। দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তে চিত্তকে বিনোদিত করার ব্যবস্থা আছে। বিনোদনের কি আইটেম আপনার চাই? হাতের কাছে রিমোট কন্ট্রোল মেশিন আছে। বোতাম টিপতে থাকুন একটার পর একটা। পশ্চিমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে সংস্কৃতি নামের বিভিন্ন অপসংস্কৃতি তৈরি করে বিশ্বময় রপ্তানি করছে, কেউ কেউ আমদানিও করছেন। যত অশ্লীলতা আছে, কুৎসিতদের জন্য কুৎসিত বিনোদন আছে সবই সরবরাহ করছে সিডিতে বন্দি করেও। ভারত ও পশ্চিমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে আকাশ সংস্কৃতি বিভিন্ন আইটেম তৈরি করে।

গত শতাব্দীর আশির দশকে বিভিন্ন কারণে লাতিন আমেরিকার প্রত্যেক দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল, কিন্তু তাদের কাছে সংস্কৃতি যাচাই বাছাইয়ের যন্ত্র না থাকায় এক পর্যায়ে উত্তেজনা থেমে যায়। ঠান্ডা হয়ে যায়, এখন লাতিন আমেরিকা খুশির বন্যায় সাঁতার কাটছে। আমাদের দেশেও যখন পশ্চিমা অপসংস্কৃতির এ বন্যার গলিজ পানি ঢুকতে থাকে তখন দেখা গেল শহর বন্দরের প্রত্যেক অলিগলিতে ভিডিও ক্লাব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে। বেশকিছু

দিন ধরে পাকড়াও চললো তারপর কি যেন একটা সমঝোতা হয়ে গেল। কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই, দেশের যুবসমাজ ও কিশোর কিশোরীরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, কিছু একটা করা দরকার। আপত্তিকর পরিবেশনায় বদঅভ্যস্ত চ্যানেলগুলো বন্ধের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ভারতের আকাশ বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোর জন্য বন্ধ অথচ ভারতীয় চ্যানেলের একটি নাটকও কখন সম্প্রচার করা হবে তা বাংলাদেশে সময়সহ প্রচারিত হয়।

আকাশ সংস্কৃতি আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে কীভাবে ব্যাখ্যার বোধ হয় কোনো প্রয়োজন নেই। নগ্নতা নগ্নতা ছাড়া তো তাদের কাছে কিছুই নেই। এই দুয়ের প্রমাণ যে যতো ঘটাচ্ছে সে ততো বেশি আকাশের বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অপসংস্কৃতির প্লাবনের মধ্যেও কোনো কোনো মুসলিম দেশ সেন্সর করে আকাশের এ সওদা প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়েছে। কারণ প্রত্যেক দেশের কাছে এই আর্ন্তজাতিক নেটওয়ার্কের লোকাল কন্ট্রোলিং ব্যবস্থা আছে। যা আপত্তিকর বলে মনে করা হবে তা প্রদর্শন না করার হুকুম শক্তভাবে দেয়া যায়। ইরান ও সউদী আরব পারছে। আমরা কেন পারবো না?

নগ্নতা বিরুদ্ধে একটা ঘৃণাবোধ সৃষ্টির জাতীয় আন্দোলন অপরিহার্য। তরুণ সমাজের মধ্যে এই জাগরণ যদি আসে তাহলে আন্দোলন সফল হয়। নৈতিকতাবোধ শক্তি, শিক্ষা ও অনুশীলন ছাড়া এই ভাইরাস বন্ধ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এই ভাইরাস প্রতিরোধে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। সেটা হলো এই অপসংস্কৃতির

কেউ মনে প্রাণে পছন্দ করে না। আল্লাহর রাসূলের না পছন্দের আর পছন্দের দিকটি যত বেশি প্রচারে আসবে শিক্ষায় আসবে আমলে অনুশীলনে আসবে এই আসমানী বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা হবে, নতুবা পরিত্রাণ নেই। হ্যা, আশার কথা, খুব দুর্বল হলেও বিপরীত একটা স্রোত একটা হাওয়া সৃষ্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আশা শুধু এই আমাদের ঈমানের তেজই আমাদের হেফাজত করতে পারে।

বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে স্যাটেলাইট তথা ইলেকট্রনিক মিডিয়া আজকের আধুনিক সভ্যতার যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবিদার। তবে এটা নির্ভর করে মূলত প্রত্যেক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সুষ্ঠু দর্শন তথা সাচ্চা জাতীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে মিডিয়ার সদ্ব্যবহারের ওপর। আজ এই মিডিয়ার বদৌলতে পৃথিবীর পরিধি এখন ক্ষুদ্র হয়ে এসেছে। এটা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের একটি প্রধান হাতিয়ার স্বরূপ।

তবে একথা সত্য যে এই ইতিবাচক দিকগুলো তখন উদ্ভাসিত হয়, যখন কিনা মিডিয়াগুলো মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অপসংস্কৃতির প্রচার ঘটলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নেতিবাচক দিকটা উদ্ভাসিত হতে থাকবে এবং মানুষও সেই সঙ্গে তার নৈতিক আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অহংকারকে ধূলোয় মিশিয়ে অপসংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরবে। ফলে দেখা যাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কারণে একটি জাতির ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা ধ্বংস হয়ে গেছে। ভারত ও

পশ্চিমা সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্লাবন আমাদের এদেশে যেভাবে আকাশ সংস্কৃতির নামে প্লাবিত হচ্ছে, তাতে আমাদের দেশের জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হচ্ছে অবহেলিত। ধরছে বিলুপ্তির পথ। যার ফলে এদেশের জীবনাদর্শ তথা সামাজিক জীবনের মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে বারবার ব্যাহত।

ভারত উপমহাদেশ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক শাসনের ফলে ঔপনিবেশিক আদর্শ ও নীতিরীতি এদেশের মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এবং তারা এদেশের সংগ্রামী মানুষের শোষণ ও শাসনের জন্য কৌশল পরিবর্তন করে স্বাধীনতার নাম দিয়ে শাসনের নামে শোষণ করতে থাকে। ফলে দিনে দিনে ইংরেজ সংস্কৃতি এদেশের মানুষের মনে শেকড় তৈরি করতে সক্ষম হয়। উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী এদেশ ত্যাগ করলেও দিনে দিনে এদেশের শাসন ও শোষণের মূল হাতিয়ার রূপে এখন বিদ্যমান স্যাটেলাইট, ফেসবুক এর মাধ্যমে অশ্লীল নৃত্যসহ নীল ছবি প্রচার করায় এদেশের মানুষ যেমন অপসংস্কৃতির বেড়িবাঁধে বন্দি তেমনি ঐসব চ্যানেল ইন্টারনেটের প্রতিনিধিরা হচ্ছে বিজয়ী।

তারা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে গিয়েও এদেশকে ধ্বংস করার সূক্ষ্ম মাধ্যম বেছে নিয়েছে। যা শাসন ও শোষণের চেয়েও হাজার গুণ বিষাক্ত। এরা অপসংস্কৃতি দিয়ে এসব দারিদ্র্য দেশগুলোর জাতীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করতে সর্বদা সচেষ্ট। এ জন্যেই তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মি. জন ফস্টার ডালেস সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে রূপদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে

পরোক্ষে প্রতিপাদ্য ছিলো ‘কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও।’ বিশ্বে যখন আমেরিকা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করাকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করতে সংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

বর্তমান বিশ্বে যে পরিস্থিতি চলছে তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়নের অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার। বিশ্বে এখন সামরিক আগ্রাসনের তুলনায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো যেমন সহজ তেমনি অধিকতর কার্যকর। আর এই অপসংস্কৃতির আগ্রাসন চালানো হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে। আরো ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমা ও হিন্দুস্তানী যৌথ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিফলিত হওয়ার বিচারে বাংলাদেশ একটি উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। মূলত ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসীরা এদেশে বেশ কিছু সেবাদাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দিন দিন ব্যাপকভাবে সেবাদাস সৃষ্টি করতে সচেষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছে তাঁবেদার রাজনীতিক এবং একশ্রেণির ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক-কলামিস্ট। এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী এদেশের সুষ্ঠু মতাদর্শগত জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পশচাদপদ দিক।

আকাশ সংস্কৃতি সম্পর্কে বড্ড দীর্ঘ একটা বয়ান দিয়ে ফেললাম। এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক। আকাশ সংস্কৃতির ছোবল থেকে

ভারতের অক্টোপাস বাঁধন আমরা ছাড়তেই পারছি না। প্রতিবেশি দেশ বলে কথা! এদের উৎকট আকাশ সংস্কৃতির বিধ্বংসী ঢেউ আমাদের মানচিত্রের ভূখণ্ড ধসিয়ে দিচ্ছে। ছোটো হয়ে আসছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মুসলিম সভ্যতার পরিধি। কুখ্যাত হিন্দুসংস্কৃতি আমাদের মুসলিম তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। ওদের কৃষ্টি-কালচার আমাদের জন্য রীতিমতো উদ্বেগ ও হতাশাজনক। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে এবং প্রবলভাবেই তা বাড়ছে। প্রতিবেশি এই বৃহৎ দেশটি কাঁটাতারের বেড়ায় ফেলানীর লাশ ঝুলিয়ে রেখে শুধু আমাদের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও মানচিত্রের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন করছে না, আকাশ সংস্কৃতির নগ্ন আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের তরুণ ও উঠতি প্রজন্মের চিন্তার স্বাধীনতা ও পবিত্রতাও চরমভাবে ক্ষুণ্ন ও ছিনতাই করে চলেছে।

দেশ স্বাধীন হলো এদেশের মানুষের ভেজা রক্তের নজরানায়, কিন্তু ভারত নিয়ে গেলো পরাজিত ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের অত্যাধুনিক সব অস্ত্র, যার বৈধ মালিক ছিল একমাত্র মূলত বাংলাদেশ। সেই যে নেয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হলো আজও থামল না সেই আগ্রাসন। বরং দিন দিন বাড়ছেই ভারতের ক্ষুধা ও পিপাসা। এই পিপাসায় মরুভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। পিপাসার্ত ভারত ফারাক্কায় বাঁধ দিলো, তিস্তার পানি চুষে নিলো, টিপাইমুখে বাঁধ দিলো, ফেনি নদীর পানি নিলো। আর সর্বশেষ হরণ করে নিচ্ছে এদেশের তরুণ প্রজন্মের মেধা ও চিন্তার স্বাধীনতা। ফলে আজ

অধিকাংশ তরুণ-তরুণী ভারতীয় নগ্ন সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতপ্রীতি নিয়ে বড় হচ্ছে এবং মনের অদৃশ্য কোণে কোনো না কোনোভাবে লালন করছে ভারতপ্রেম। একটি দেশের চূড়ান্ত সর্বনাশের জন্য এরচেয়ে বড় আতঙ্ক ও উদ্বেগের বিষয় আর কী হতে পারে?

এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মাথা ব্যথার কারণ নয়, সারাবিশ্বের জন্যই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ। সারাবিশ্বকেই আজ ভারতীয় ললনারা তাদের উদ্বাহু নৃত্যের নোংরা ছলনায় হতবিহ্বল করে চলেছে। তারা ক্রমশ দুর্বল হতে চলেছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি। আর প্রতিবেশি দেশ হিসেবে এর বিষাক্ত ছোবল সর্বাগ্রে পড়ছে আমাদের মুসলিম যুবসমাজের ওপর। এতে যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম, নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ভাবগাম্ভীর্য ব্যাহত হচ্ছে এবং আরো উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে এই কাজটা করা হচ্ছে। ভারতের কিছু মুসলিম অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, যাদেরকে ব্যবহার করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতীয়রা মুসলিম প্রতিবেশি দেশগুলোতে আকাশ সংস্কৃতির মরণছোবল বিস্তার করছে।

বড্ড দুঃখ লাগে মুসলিম পরিচয় নিয়ে শাহরুখ খান সেদেশের ব্রাহ্মণ কন্যা গৌরীকে হিন্দু রীতি মোতাবেক সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করেছেন! এটা তার ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু আকাশ সংস্কৃতির হাওয়ায় তা আমাদের সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিষবাষ্পের মতো তা মুসলিম সমাজকে বিষাক্ত করছে। এই শাহরুখ কয়েকদিন আগে তার মেয়েকে প্রেমিক খুঁজে নেয়ার

পরামর্শ দিয়েছেন! সেই সঙ্গে কেমন প্রেমিক বেছে নিতে হবে সে ছবকও মেয়েকে দিয়েছেন তিনি। তিনি মেয়ে সুহানাকে বলেছেন, যদি তুমি কারো সঙ্গে ডেটিং দিতে সিদ্ধান্ত নাও তাহলে এমন ব্যক্তিকে বেছে নিও যে আমার মতো। শাহরুখ খান টুইটারে এক পোস্টে লিখেছেন, ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমি একজন চমৎকার মানুষ। আমি যথেষ্ট শালীন, ভালোবাসাময়, শিক্ষিত ও যত্নবান। আমি আমার মেয়েকে বলবো যে, যদি তার কোনো বয়ফ্রেন্ড খুঁজে নেয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমার ক্ষোভকে এড়িয়ে তাকে এমন একজনকে বেছে নিতে হবে যে হবে আমার মতো।'

নিজকন্যাকে এই জঘন্য পরামর্শ দিয়ে শাহরুখ খান কতটুকু অপরাধ করেছেন, সেটা হয়ত তার কন্যার ভবিষ্যত ও ইতিহাস নিরূপণ করবে। কিন্তু এর সঙ্গে তিনি যে অপরাধটি করেছেন তা এক কথায় ক্ষমার অযোগ্য। তিনি নিজ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তাবত মেয়েদেরও অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি আমি এ কথা আমার মেয়েকে বলতে পারি তাহলে এ কথা সব মেয়েকে বলতে পারি।'

সুতরাং এটা যে আকাশ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে অন্যদের মধ্যেও এই অশালীনতা ও জঘন্য অনাচার বিস্তারের প্রয়াস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতীয় আকাশ সংস্কৃতি এভাবেই গিলে খাচ্ছে আমাদের তরুণ-যুবকদের মাথা, মেধা, মননশীলতা ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা। এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে সচেতন ও সতর্ক করতে না পারলে দেশ থেকে শুধু ইসলামী আদর্শই ক্ষতিগ্রস্ত হবে

তাই নয়; দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়বে।

তবে আমরা আশাবাদী একারণে যে, দেশে এখনও অনেক সচেতন, আত্মমর্যাদা ও ইসলামী ভাবনাবোধসম্পন্ন তরুণ-যুবক আছেন। বিষয়টি বুঝা যায় ওই সংবাদের ওপর পাঠকদের মন্তব্য পাঠ করেই।

আমি আশাবাদী এভাবে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবসম্প্রদায় ইসলামী আদর্শ ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে ভারতসহ বিশ্বের সকল আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে রুখে দাঁড়াবে। কারণ, তারুণ্যের রক্তে উচ্ছৃঙ্খলার জোর যত বেশি, প্রতিরোধ, দেশপ্রেম ও স্বকীয়তাবোধের উষ্ণতা তারচেয়েও বেশি। তাছাড়া বাংলাদেশের মানুষ সর্বদাই নিজস্ব স্বাধীনতা-স্বকীয়তা রক্ষায় সিদ্ধহস্ত।

ইন্ডিয়ারই ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র সম্পর্কে "বাঙ্গালার ইতিহাস" বইটিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মাটি নরম কিন্তু জায়গা কঠিন এখানে মানুষ অপেক্ষা মাটির প্রভাব অধিক।... এই স্বাতন্ত্র্যলোলুপ প্রাচ্য সমাজকে পুনঃপুনঃ আর্যাবর্তের আদিসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিবার আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু মাটির গুণে সে আয়োজন পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যাহারা এ দেশের জনসাধারণ, তাহারা যেমন স্বতন্ত্র, সেইরূপ স্বতন্ত্রই রহিয়া গিয়াছে; বরং যাহারা তাহাদিগকে পরতন্ত্র করিয়া আর্যাচারী করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহারাও

নানা বিষয়ে আদিসমাজের বিধিব্যবস্থা পরিবর্তিত করিয়া, স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।... শাস্ত্রবচন যখন সমুদ্র-যাত্রার প্রবল প্রতিবাদ-প্রচারে সম্পূর্ণ অবসরশূন্য, তখন বাঙালি সমুদ্রপথে নানা দিকে দ্বীপোপদ্বীপে বাণিজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তীহস্তে প্রধাবিত।... বাঙালির আচার ব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লোকতত্ত্বের সকল স্তরেই স্বাতন্ত্রের ছায়ামূর্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালিকে জানিতে হইলে, গ্রন্থকীট হইলেই, সকল তত্ত্ব জানিয়া চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙালিকে জানিতে হইলে, গ্রন্থ ছাড়িয়া, লোকতত্ত্বের মূল তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে।.... বঙ্গভূমি আর্যাবর্ত ও বঙ্গসমাজ আর্যসমাজ হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র দেশ ও স্বতন্ত্র সমাজরূপে আর্যাবর্তের ও আর্যসমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাই।...

বহুসংখ্যক অনার্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক আর্যবীরের পক্ষে জ্ঞানবলে, কৌশলবলে যন্ত্রবলে বা সুপরিচালিত বাহুবলে বিজয়রাজ্য সংস্থাপিত করা সম্ভব হইলেও বিজিত সমাজের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পরিবর্তিত করা সম্ভব হইতে পারে না। বরং সেরূপ ক্ষেত্রে বিজেতার পক্ষে আপন ভাষা ও আচার ব্যবহারের পূর্বতন বিশুদ্ধি রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে পরিমাণে নবরাজ্য সুগঠিত করিবার জন্য ভাষা ও লোক-ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হয়। বাঙ্গালীর লোক-ব্যবহার এই সকল পরিবর্তনের প্রভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আরম্ভ কোন্ পুরাতন যুগে, তাহার সীমানির্দেশের সম্ভাবনা নাই। আর্যাবর্তের

আর্যসমাজের কেন্দ্রস্থলে তাহার মূল প্রস্রবণ নিহিত হইলেও, বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে তাহার সহিত নানা নদ-নদী সলিলসম্ভার মিলিত হইয়া তাহাকে কূলপ্লাবিনী প্রবল বন্যার ন্যায় শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।...

বঙ্গভাষা স্বতন্ত্র ভাষা। তাহার গঠন প্রণালীতে স্বাতন্ত্র্যের অভাব নাই। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারেও এইরূপ কত স্বাতন্ত্র লক্ষিত হয়। তাহার শিল্পের স্বাতন্ত্র সর্বত্র সুপরিচিত।...

বাঙ্গালীর আধুনিক ইতিহাসেও স্বাতন্ত্র্যের অভাব নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যে পথে গিয়াছে, বাঙ্গালী সকল বিষয়ে, সকল সময়ে সে পথ অবলম্বন করিতে সম্মত হয় নাই। আধুনিক ইতিহাসে বাঙ্গালী ভীরু এবং কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কৃত হইলেও বাঙ্গালি স্বাতন্ত্রপ্রিয়-স্বাধীনতার উপাসক-অপরাজিত পৃথক জাতি। বাঙ্গালী কখন বৌদ্ধ হইয়াছে, কখন হিন্দু হইয়াছে, কখন হিন্দু মুসলিম বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কদাচ দীর্ঘকাল পরাধীন থাকতে সম্মত হয় নাই। পাঠান মোঘল কেহই বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই; ইংরেজেরাও বাঙ্গালীকে রণক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া, শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অস্ত্রবলে পরাভূত- বাঙ্গালা দেশ অস্ত্র বলে পরাভূত হয় নাই।’

সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে বাঙ্গালী মানুষ কখনও সার্বভৌমত্বেও পরাধীনতা মানেনি সেই বাঙ্গালী মুসলিম কারো সাংস্কৃতিক পরাধীনতাও মানবে না। অবশ্য এর জন্য চাই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা ও অদম্য সাহস।

## নির্লজ্জতায় সম্মানবোধ!

মানসিকতার পরিবর্তন ও বিবর্তন মানবজাতির সবচেয়ে কাছের ঘটনা। যুগের কোনো অধ্যায় ও কোনোকালেই বিবর্তন চিন্তা মানুষের সঙ্গ ছাড়েনি। তাই সময় যত গড়িয়েছে মানুষের চিন্তা ও ভাবনায় নতুন নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে। নতুন নতুন এই ভাবনা কোনো কোনো সময় বিশ্ববাসীকে করেছে বাধিত আর কখনো করেছে বিব্রত। বিশেষত অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের শিল্পবিপ্লব অর্থপূজারী বিশ্বের ভাবনায় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। এই বিপ্লব মানুষের অন্তরে শুধু অর্থলিপ্সা এবং অর্থপিপাসার অনুপ্রবেশ ঘটায়নি, বরং গোটা সত্তা এবং লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় অর্থক্ষুধার নিষিদ্ধবৃক্ষ রোপণ করেছে।

ফলে অর্থক্ষুধার এই নিষিদ্ধবৃক্ষ মানুষকে মানবিক ও নৈতিকতার বেহেশত থেকে অনেক দূরে ছিটকে দিয়েছে। ফলে নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষের একেকটা অন্তর অর্থলিপ্সার হাবিয়া দোযখে পরিণত হয়েছে; যে দোযখে নিত্য গুঞ্জরিত হয় ‘হাল মিম মাজিদ’ এর সুর। এই সুর স্রোতের মতো বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পের কাঁচামালের খোঁজে। আর অতি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, শিল্পসভ্যতার এই যুগে চতুর বণিকসমাজের দৃষ্টিতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাঁচামাল ছিল নারীসমাজ। তাই শিল্পে নারীর ব্যবহার ছিল চরম প্রতারণামূলক ও নারীসত্তার জন্য প্রলয়ংকরী সিদ্ধান্ত।

তবে বণিকরা জানত, নারীসমাজকে এই পথে টেনে আনা দুঃসহ নয়, দুর্লভও নয়। অর্থ ও খ্যাতির একটু জাল বিছানোর প্রয়োজন

মাত্র। বণিকদের সেই জাল বিছানোর ধারা শেষ হয়নি এবং নির্দিষ্ট কোনো অবয়বেও তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। দিন দিন তারা নিত্যনতুন আবেষ্টনে সামান্য কিছু পয়সায় নারীদেরকে ব্যবসার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করছে। ব্যবসার প্রয়োজনেই তারা নারীদেরকে কখনও নগ্ন করছে কখনও অর্ধনগ্ন করছে এবং কখনও 'মা', 'বোন', 'কন্যা-জায়া'র আসনে বসিয়ে অধিকার (?) দেয়ার নামে গলা ফাটাচ্ছে। পুকুরচুরি আর ধোঁকাবাজি কাকে বলে!

খুবই বেদনায়ক ব্যাপার হচ্ছে, নারীরা প্রতারকদের ফাঁদকে ভেবেছে মরুদ্যান। মরীচিকাকে ভেবেছে জীবনতৃষ্ণার অবারিত সুপেয় বারি। তাই অর্থতৃষ্ণা নিবারিত করতে কখন যে চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে তা টেরও পায়নি এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথও খোঁজার চেষ্টা করেনি। তাই ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবতে থাকা এই নারীসমাজ কোথায় তাদের সম্মান, কারা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তা ভাবেওনি, ভাবার প্রয়োজনও মনে করেনি। ফলে এমন কর্মে তারা গৌরববোধ করছে এবং এমন প্রক্রিয়ায় সম্মানিত হতে চাচ্ছে যা কৌতুক বৈ কিছু নয়।

এবার আসি মূল ঘটনায়। ওই শিল্পবিপ্লবের পথ ধরেই আবির্ভাব ঘটেছে মিডিয়ার। মিডিয়াকে লালন করে বণিকশ্রেণি এবং বণিকশ্রেণিকে বাঁচিয়ে রাখে মিডিয়া। আর এই নারীবিধ্বংসী মিডিয়ার প্রধান খোরাক হচ্ছে নারী। মিডিয়ায় প্রচারিত কেশতেলে নারীর উপস্থিতি না হয় যৌক্তিক। কিন্তু পুরুষের গোঁফ কাটার ব্লেড-রেজারের বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহারের যৌক্তিকতা কতটুকু? মিডিয়া

কোনো জবাবদিহিতার ধার ধারে না, তাদের চাই সর্বক্ষেত্রে নারী দেহের কমনীয় ও উত্তেজক উপস্থিতি, যা পুরুষকে আকৃষ্ট করবে সর্বোতভাবে ও সর্বব্যাপী।

মিডিয়ায় নারী ব্যবহারের এই ব্যাপকতা পুরুষকে প্রবলভাবে টানতে থাকে এবং নারী হয়ে ওঠে মিডিয়ার ব্যাপকতার প্রধান হাতিয়ার। এই ধারা উত্তেজক হতে হতে এমন একপর্যায়ে পৌঁছে, যখন নারীদেহের নগ্ন উপস্থিতিই হয়ে ওঠে পত্রিকা বা সংশ্লিষ্ট মিডিয়ার মূল উপাদেয় এবং বিশ্বে এমন অনেক মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে যার প্রচ্ছদে মাখানো হয় উলঙ্গ নারীদেহ। প্লেবয় নামের একটা ম্যাগাজিন কামনাবিলাস পুরুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষের একটি ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটির প্রতি সংখ্যায় বিশ্বের কোনো না কোনো নারীর নগ্ন ছবি ছাপা হয়।

পত্রিকায় প্রকাশ; বৃটিশ এক শিল্পপতির কন্যা তামারা নাম্নী এমনি এক যুবতী পুরুষদের প্রিয় 'প্লেবয়'-র প্রচ্ছদে নগ্ন ছবি স্যুট করতে পেরে বেশ উচ্ছসিত। বৃটিশ শিল্পপতি বার্নি এক্লেস্টনের মেয়ে তামারা। মেয়ের নগ্ন ছবি স্যুটের ব্যাপারে বেশ উচ্ছসিত পিতা বার্নিও! তামারা বলেন, সম্পূর্ণ নগ্ন হতে প্রথম পর্যায়ে একটু বিব্রতবোধ হলেও পরে আর কোনো সমস্যা হয়নি। প্রথমদিন বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। তবে তৃতীয় দিন আমি এতোটাই স্বাভাবিক যেমনটি এখন দেখছেন।'

তামারা আরো বলেন, 'শরীর নিয়ে আমি অনেক বেশি গর্ববোধ করি। এটিকে আমি উদযাপন করতে চাই। আমার মা এটি দেখে

খুব খুশি হয়েছে এবং আমার বোনও একই কাজ করতে আগ্রহী। তবে আমার বাবা এটি দেখেছে কিনা আমি জানি না। আমার ধারণা উনি এ সম্পর্কে জানেন।'

এ সম্পর্কে তামারা আরো বলেন, 'আমার এ সৌন্দর্য সম্পর্কে আমি খুবই আনন্দিত। একজন নারী হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। আমার ছবি নিশ্চয় বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে আপনাদের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।'

পত্রিকা জগতের পুরুষদের প্রিয় প্লেবয় ম্যাগাজিন। প্রায় ৬০ বছর ধরে বিশ্বের সুন্দর নারীদের এর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় স্থান দিয়ে আসছে বলে জানান তামারা। মে মাসের মূল প্রচ্ছদে নিজেকে দেখে তামারা সম্মানিতবোধ করছেন বলে জানান।'

পাঠক! এই রিপোর্টটি পাঠ করে মন্তব্য করার কিছু আছে? তাই বলছিলাম, চতুর বণিকরা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সম্মানিত নারীকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় শতভাগ নয়, হাজারভাগ সফল হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। নারীদেরকে শুধু তাদের সুবিধামাফিক স্থানে ব্যবহারই করা যাবে না; তাদের অনুভূতিও নিঃশেষ করা যাবে স্বয়ং বণিকরাও এতটুকু কল্পনা কখনও করেনি। কিন্তু কল্পনার সব প্রাচীর ভেদ করে নারী আজ সীমালঙ্ঘনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপর সীমালঙ্ঘন করার মতো কোনো জায়গাই রাখেনি! অন্যথায় একজন নারী তার নগ্নদেহ প্রকাশ করে উচ্ছ্বসিত হয় কী করে? নারী জন্মের আনন্দ কি তবে নগ্ন-প্রকাশে সন্নিহিত? তামারা তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে? একজন

নারী নগ্ন হওয়ার পর তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলতে কীইবা বাকি থাকে? আজ কি তবে বিবসনা নারীই আধুনিক বিশ্বের আদর্শ? যদি তাই না হবে তবে তামারার আরেক বোন কেন বোনের অনুসরণ করে নিজেই এভাবে পোজ দেয়ার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে? আর মা-বাবাই যুবতী কন্যার এমন নগ্নদেহ দেখে পুলকিত হন কী করে?

কন্যার কীর্তিতে পিতার উচ্ছসিত হওয়া যৌক্তিক। কিন্তু পত্রিকাওয়ালারা তো তামারাকে শো করেছে বিশ্বের কোটি যুবকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কোনো আবিষ্কার, পরীক্ষার বিস্ময়কর ফলাফল বা এজাতীয় কোনো কীর্তির কারণে নয়। বরং সৃষ্টিগত কারণেই একজন পুরুষ বিবসনা নারীদেহে প্রলুব্ধ হবে, এই উদ্দেশ্যে তারা এই ছবিটা ছেপেছে। সুতরাং বিবসনা যুবতীর প্রলুব্ধ করা নগ্ন ছবিতে লোলুপ যুবকদের সঙ্গে বাবাও উচ্ছসিত হবেন কেন?

## মুদ্রার অপর পিঠ

তবে মুদ্রার অপর পিঠ থাকার মতো সব ঘটনার পশ্চাতেই ঘটনা থাকে। এক নারী নগ্ন পোজে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজছেন তো অপরজন করছেন এর বিরুদ্ধে লড়াই! সচেতন করছেন যুবকদেরকে, নগ্নতার নিন্দা করছেন স্বয়ং নগ্নরাই।

এক সময়ে আকর্ষণীয় ফিগার নিয়ে নজর কাড়া পোজ দিতে জুড়ি ছিল না  রোমোলা গারাইয়ের। ব্রিটিশ এই টেলিভিশন নাট্যশিল্পী দু'বার গোল্ডেন গ্লোব এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এসকোয়ার থেকে শুরু করে নামকরা সব সাময়িকীতে তার ছবি ছাপা হলে ভক্তকূলের বুকে

ঝড় উঠত। সেই রোমোলা গারাইয় এখন লড়াই শুরু করেছেন পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে। তার মতে ছেলেদের সাময়িকীতে মডেলদের নগ্ন পোজ অবশ্যই সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে।

এক দশক আগেও তিনি এধরনের পোজ দিয়েছেন, সে বিষয়টি মনে করিয়ে দিলে রোমোলা গারাই স্বীকার করেন অবশ্যই সেগুলো সামাজিক সমস্যার অংশবিশেষ। কিন্তু এখন তার নতুন লড়াই হচ্ছে টেসকোর পক্ষে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রচারিভিযান চালানো। নগ্নতা বা এধরনের উদ্যোগ যা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে এখন রোমোলা।

৩১ বছরের এই নাট্যঅভিনেত্রী বলেন, এখন সময় এসেছে নগ্নতা যেভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার। তিনি জু এন্ড নাটস' এর মতো সাময়িকী বন্ধের দাবি জানান, যেখানে ছেলেদের জন্যে মেয়েদের নগ্ন পোজ দিয়ে ছবি ছাপা হয়। পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রোমোলা গারাইয়া বলেন, টিনএজ থেকে শুরু করে শিশুরা যেভাবে পর্নোগ্রাফির ছোবলে পড়ছে তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। কচি মনে এধরনের প্রকাশনা পরবর্তীতে তাদের অপরাধপ্রবণ হতে উস্কে দেয়।

তিনি বলেন, কোনো নারীর অধিকার নেই অন্যের সমস্যা সৃষ্টির জন্য নিজেকে নগ্ন হয়ে ছবি তোলার। তিনি বলেন, তবে মিডিয়া সবসময় নারীর আকর্ষণীয় ফিগারের কাছে দুর্বল বলে অনেকের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই তো জীবনের বাস্তবতা। মোটা চোখে যা সুন্দর, বাস্তবতার চোখে তাই কুৎসিত, অসত্য। বস্তুত এভাবেই মানুষের জয়-পরাজয়ের হিসেব হয়। যারা জীবনকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে না মেপে গোটা জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন এবং গোটা সমাজকে সুন্দর করে দেখতে চান তারা সত্যের পথ খুঁজে পান। এমনকি ভুল করার পরও তাদের সৎপথে ফিরে আসতে সমস্যা হয় না। এক্ষেতে রোমোলো অন্তত সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের ক্ষেত্রে নগ্নতা ও নারীদেহের স্বাধীনতা কত ভয়ংকর তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং নিজের দেহে হলেই যে তা যেনতেনভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজের হাজার মানুষের জীবন ধ্বংস করবে, পরিবেশকে অশান্ত করে তুলবে সেই অধিকার কারো নেই। ধন্যবাদ রোমোলোকে!

## সৌন্দর্যের জন্য ভিক্ষা!

ইসলামে ভিক্ষার মাধ্যমে উপার্জন এবং অপরের গলগ্রহ হওয়ার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। ইসলাম মূলতই আত্মমর্যাদার ধর্ম। তাই ইসলাম তার অনুসারী কাউকে একেবারে লাচার হওয়া ছাড়া কারো কাছে হাত পেতে নিজের আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দেয়ার অনুমতি প্রদান করে না। বরং সর্বাবস্থায় নিজ হাতের উপার্জনকে উৎসাহিত

করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তাই জীবিকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হালালপন্থা অবলম্বন করা এবং হারাম, সন্দেহজনক ও লজ্জাজনকপন্থা থেকে দূরে রাখা প্রতিটি মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দায়িত্ব। হাদীসে মানুষের গলগ্রহ না হয়ে বরং হালাল উপার্জনকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার কোনো কোনো হাদীসে ব্যবসা এবং হাতের কামাইকে সর্বোত্তম উপার্জন আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন-

«أفضلُ الكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ»

'মানুষের সর্বোত্তম উপার্জন হলো বৈধ ব্যবসা এবং হাতের কাজের উপার্জন।' [ছহীহুল জামে' : ১১২৬, সহীহ]

শেষ যুগে হারামের ছড়াছড়ি এবং হালাল উপার্জনের ঘাটতি দেখা দেবে বলে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে। এই প্রচেষ্টা নবীদেরই পবিত্র আখলাকের অন্যতম অংশ। যেমন, হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

«أُمِرَتِ الرُّسُلُ أَنْ لا تَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّباً ولا تَعْمَلَ إِلاَّ صالِحاً»

'রাসূলগণকে একমাত্র হালাল ভক্ষণ এবং একমাত্র নেক কাজের আদেশ করা হয়েছে।' [ছহীহুল জামে' : ১৩৬৭, হাসান]

আল্লাহ তা'আলা অলস লোক পছন্দ করেন না। বস্তুত হালাল উপার্জনে সাধারণ পেশা অবলম্বন করা আদৌ দোষের বিষয় নয়। স্বয়ং নবী-রাসূলগণও সাধারণ পেশা অবলম্বন করতে লজ্জাবোধ

করতেন না। আল্লাহর নবী মুসা ‘আলাইহিস সালাম কায়িক শ্রম করেছেন। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও শারীরিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন। তাই হালাল রুজির স্বল্পতায় বিচলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-

«نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نفسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمِ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»

‘পবিত্র প্রাণ (জিবরীল ফেরেশতা) আমার অন্তরে ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং তোমরা রিজিক অন্বেষণে সুন্দরপন্থা অবলম্বন করো। আর রিজিকপ্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদের কাউকে অবৈধপন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত না করে। কেননা আল্লাহ তা‘আলার কাছে যা আছে তা তার আনুগত্য ছাড়া হাসিল হয় না।’ [জামে ছগীর : ২২৭৩, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, বিস্তারিত দেখুন, সহীহুল জামি‘ আস-সাহীহ ওয়া যিয়াদাতুহু : ১/৪১৯]

অবৈধ বা সন্দেহজনকপন্থা পরিহার করে হালাল রুজির পন্থা অবলম্বন করাই একজন আলেমের বড় শান। হাদীছে এ ধরনের সাহসী লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«التَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَالتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوقٌ»

‘ভীরু ব্যবসায়ী বঞ্চিত এবং সাহসী ব্যবসায়ী রিজিকপ্রাপ্ত হয়।’ [জামে ছগীর : ৩৩৯৫, হাসান]

দীনী দায়িত্বগুলো পালনের পাশাপাশি যদি বৈধ কোনো ব্যবসার সুযোগ এসে যায়, তবে তা হাতছাড়া করা ঠিক নয়। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাও অপছন্দ করেন। অন্যের কাছে হাত পাতার চেয়ে নিজে যে কোনো হালাল পন্থায় উপার্জন করা উচিত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ»

‘ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উচু হাত নিচু হাত থেকে উত্তম। খরচকারী হাত হলো উচু হাত আর নিচু হাত হলো প্রার্থনাকারী হাত।’ [মুসলিম : ১০৩৩]

ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করলাম। সাধারণত মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা না মেটাতে পেরেই ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। তবে জীবনধারনের এসব মৌলিক কারণেও ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয়, ঘৃণিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস্টিনা এনড্রিউ নামের এক ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমেছেন ভয়ঙ্কর এক উদ্দেশ্যে। নিজের স্তনের আকার বৃদ্ধির জন্য

টাকা যোগার করতেই তিনি এখন জনে জনে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছেন ফ্লোরিডার রাস্তায়!

জানা যায়, ফ্লোরিডার এক ব্যস্ত রাস্তায় ভিক্ষারত ওই নারী ভিক্ষুক একটি প্ল্যাকার্ডে নিজের উদ্দেশ্যের কথা লিখে সবার কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করছেন। তার প্ল্যাকার্ডে লেখা- ‘NO HOMELESS NEED BOOBS’ ‘আমার খাদ্য কিংবা আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। ‘শারিরীক সৌন্দর্য’ বৃদ্ধি করতে অর্থ প্রয়োজন।’

এ বিষয়ে ক্রিস্টিনা জানান, ফ্লোরিডার পেনসাকোলা রোডের কোণায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে তিনি কিছু অর্থ জমিয়েছেন। ক্রিস্টিনা বলেন, ‘আমি শুধু চাই আমার বুক যেন উন্নত হয়। কারণ আমার যা আছে তাতে আমি খুশি নই। আর যেহেতু আমার টাকা নেই তাই এটাই ভালো পন্থা। মানুষ গৃহহীন চিহ্ন লাগিয়ে ভিক্ষা করে। আমি তা নই বরং তাদের চেয়ে সৎ। কারণ আমি সত্যি কথা বলছি।’

বিশ্বটা আজ কামনা-বাসনার জ্যান্ত খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান, আধুনিকতা, উৎকর্ষ ও মানবিক ভাবনার এমন সমৃদ্ধ সমাজেও আমরা কেন যেন বিজ্ঞানময়, মানবিক ও শালীনতাবোধের সীমানায় অটল থাকতে পারছি না। যান্ত্রিক উৎকর্ষ মানবজীবনে যত দ্রুতগতিতে প্রবেশ করেছে তার চেয়ে তীব্র গতিতে মানবজীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব, শালীনতাবোধ ও চক্ষুলজ্জা। উৎকর্ষসিক্ত এই যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় মানবতা ও মনুষ্যত্ব যেন অন্তসারশূন্য এক রঙিন প্রচ্ছদমাত্র। যেকোনো মূল্যে নিজের প্রবৃত্তি

লালন ও বাসনাকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাবার দুর্বার ইচ্ছা আজ মনুষ্যত্ব ও শালীনতাবোধের শেষ নিশানাটুকুও মিটিয়ে দিচ্ছে।

তাই কথিত আধুনিকসভ্যতায় যাপিত আমাদের এই জীবন ও মনুষ্যত্ব আজ শৃঙ্খলিত, বাক্যহীন, স্তব্ধ, বিমূঢ় এক ছায়াশক্তি। বিবেকবোধ ও শালীনতা আজ অধুনালুপ্ত। পৃথিবীটা যেন নির্জলজ্জার অগ্নিগোলকে পরিণত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার রিপুর খোঁয়াড়ে। বলা যায় এই অনৈতিক ভাবনা স্পর্শ করেছে বিশ্বের অধিকাংশ নাগরিককে। বলতে গেলে প্রায় সব ধরনের প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবর্তিত হচ্ছে অর্থ ও দেহকে কেন্দ্র করে। ফলে গড়ে উঠছে লালসা ও রিপুকেন্দ্রিক মানসিকতা। এরফলে প্রতিনিয়ত উজাড় হচ্ছে মনুষ্যত্বের সব্জ-শাদাব বাগিচা, ফুলেলবাগান। সমাজ ব্যবস্থায় যদি শালীনতাবোধ না থাকে তাহলে সেই সমাজ কত দিন টিকতে পারবে সেটা পরের কথা, সেই সমাজের চেহারা কতটা বিবর্ণ, কুৎসিত এবং কদাকর হতে পারে সেটাই আগে বিবেচনা করা দরকার।

এই বিবেচনাকর্মে আমরা রীতিমতো গলদঘর্ম! আমেরিকা-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো বিশ্ববাজারে শুধু মোড়লগিরি করেই বেড়ায় না; নিজেদেরকে পরম সভ্য বলেও দাবি করে। কিন্তু আজ অবধি ওরা তাদের কথিত সভ্যতার সংজ্ঞা দেয়নি, ভালো মানুষগিরির ব্যাখ্যাও দেয়নি। কিন্তু আমরা তাদের সভ্যতার যেসব নিদর্শন প্রতিনিয় প্রত্যক্ষ করি তা আমাদেরকে সভ্যতার সংজ্ঞা কিংবা সভ্যতার দাবিদারদের প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে। কারণ, ইউরোপ-

আমেরিকায় এমন সব ঘটনা সংঘটিত হতে দেখি যা কোনো সভ্য সমাজে তো দূরের কথা জংলি সমাজেও সম্ভব নয়।

একজন নারী কতটা নির্লজ্জ হলে প্রকাশ্যে রাজপথে ব্যানার টাঙিয়ে বক্ষবৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করতে পারে সেটা কল্পনা করা যায়? এরূপ একজন নারী যেদেশের নাগরিকত্বের প্রতিনিধিত্ব করে সেই দেশকে কীভাবে সভ্য দেশ বলা যায়? কিন্তু এটাই বাস্তব, টাকার জোরে, ক্ষমতার বলে আজ শুধু অন্যদেরকে দাবিয়েই রাখা হচ্ছে না; সভ্যতার টিকিট ক্রয় এবং তা ফেরিও করা হচ্ছে! ফলে এরা কখনও এসব অশ্লীল, গর্হিত ও শালীনতাবর্জিত কাজে বাঁধ সাধবে না। এই বাঁধ না সাধার আরো কারণ আছে- বাণিজ্য। এরা বাণিজ্যিক কারণেই নারীকে অশ্লীলতার প্রশিক্ষণ দেয় এবং অশালীন কাজে লিপ্ত হতে দেখে বাণিজ্যিক ফায়েদার হিসেব করে।

আমরা জ্ঞানী-দার্শনিক ও হাকিমদের হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা কেবল কর্ণের বিনোদন হিসেবে শ্রবণ করি কিংবা অতি রসিক হলে কেউ কেউ বাণীগুলো বাঁধিয়ে ঘরেরও সৌন্দর্য বর্ধন করি। কিন্তু কথাগুলো দিয়ে আমরা মন সাজাই না কিংবা মনটাকে ঘরের মতো সুন্দর করার জন্য বাঁধাই করি না। লং ফেলো নামের একজন মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘একজন মহিলা সুন্দর হওয়ার চেয়ে চরিত্রবান হওয়া বেশি প্রয়োজন।’

লং ফেলো যদি আজ জীবিত থাকতেন তবে লজ্জায় হয়ত তার এই কথাটা উঠিয়ে নিতেন। যে সমাজের একজন নারী তার ‘শরীর’

উন্নত করতে প্রকাশ্যে ব্যানার-ফেস্টুন টাঙিয়ে ভিক্ষা করতে পারে, সেই সমাজে আর যাই হোক এধরনের নীতিবাক্য মানায় না!

## ইজ্জত বেচে শিক্ষা

‘ইফ এনি ওয়ান ওয়ান্ট টু সেক্স দ্যান ইউ ক্যান কল টু মি পার আওয়ার ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ানলি। ডোন্ট মিট টু আউট সাইট।’

ফেসবুকের পাতায় আকর্ষণীয় একটি টু কোয়ার্টার ছবির সঙ্গে এই বাক্য সম্বলিত পোস্ট দিয়েছে একটা মেয়ে। বিষয়টি কৌতূহলের। তাই প্রকৃত রহস্য ও ঘটনা জানার জন্য কল দেন জনৈক সাংবাদিক। ফোন গ্রহণ করে মেয়েটি বলে, নাম্বারটি কোথায় পেয়েছেন? কী নাম লেখা হয়েছে ওখানে? লোপা। কবে আসতে চান? কোথায় আসতে হবে? মিরপুর ১১ ইস্টার্ন হাউজিংয়ে। আমার বাসায়। অন্তত দুই ঘন্টা আগে ফোন দিতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ তো ভাইয়া! কোথায় পড়ছেন? জবাবে মেয়েটি একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলল। এরপর বলল, এত কথার দরকার নেই, কবে আসতে চান বলুন? এখন তো মাসের মাঝামাঝি। বেতন পাওয়ার পর আসব- বলে লাইন কেটে দেন সাংবাদিক।

সাংবাদিক আরো জানান এরপর ট্যাগ সাইটে মেয়েটির নাম ও বয়স উল্লেখ করে ওয়েব পেজটিতে সার্চ দিলে লোপার ছবি ও ভিই প্রোফাইল আসে। অনুসন্ধান করে দেখা যায় লোপা নামে যে ছবি দেখানো হয়েছে তা আসলে দক্ষিণ ভারতের একজন নায়িকার ছবি। এরপর ফোন দেয়া হলে সে নিশ্চিত হয়ে নেয় এবং লোকেশন বাতলে দেয়। আর বলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওখানে নেমে সোজা

দোতালায় চলে আসবেন। বাম দরজায় করাঘাত করবেন। নতুবা মিস দেবেন।

সাজকানন বিউটি পার্লারের কাছে দুই মিনিট অপেক্ষা করতে বলা হয়। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর মেয়েটি ওই সাংবাদিককে ঘরে বসতে দেয়। খাতার ওপর লেখা তসলিমা। তসলিমা বলে নেটে লোপা লিখেছি, ছবিটিও আমার নয়। ভারতীয় এক মডেলের। সাংবাদিক জানতে চান, এক ঘণ্টার হিসাব হবে কখন থেকে? এইতো কথা বলা শুরু থেকে! এই এক ঘণ্টায় যতবার ইচ্ছা ততবার....পারবেন।

নেটে আহ্বান জানানোর চিন্তা মাথায় কীভাবে আসল? সাংবাদিক তা জানতে চাইলে মেয়েটি বলল, আগেই বলেছি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। প্রচুর অর্থের করকার। বিবিএর থার্ড সেমিস্টারে পড়ছি। সামনে আরও ৯ সেমিস্টার বাকি। পুরো কোর্সে আমার খরচ হবে সাড়ে তিনলাখ টাকা। মানিকগঞ্জের একটি ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারমিডিয়েট দিয়েই বন্ধুর হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে আসি। কয়েক মাস পর স্বামী উধাও হয়ে যায়। বাবা আর্মি অফিসার তিনি তা মেনে নেননি। আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও তার ঘরে আর ফিরে যাইনি। ছেলেবেলার এক বন্ধুর কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চাইলে সে বলে আমি টাকা দেবো কিন্তু তুই কী দিবি? ভালোই তো। পৃথিবী হচ্ছে গিভ এন্ড টেকের জায়গা। কিছুটা আঁচ করতে পেরে তাকে বলি কী চাও? সে বলে এক রাত কাটাতে চাই।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে সিদ্ধান্ত নিই। আমার মনে তখন নতুন করে পড়াশোনা করার আনন্দ! রাত কেটে যায়। স্বামী

উধাও হয়ে যাওয়ার পর ওই রাতটি অনেক আনন্দে কেটে যায়। বন্ধু আমাকে সারারাত মাতিয়ে রাখে। তখন মিরপুরের এক বাসায় সাবলেট থাকতাম। পরেরদিন ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়। ভাবি, আমিও কি তবে আর দশটা মেয়ের মতো প্রফেশনাল হওয়ার পথে পা বাড়ালাম? এপথে তো আমার নিয়মিত হাঁটাচলা করা সম্ভব নয়। পড়াশোনা আছে! নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবার সামনেও দাঁড়াতে হবে। পড়াশোনা শেষ করে কোচিং করেও মাসে লাখ টাকা কামাই করছি। আমি ভালো আছি।

সাধারণ মেয়ের মতো এ হোটেল ও হোটেল করলে আমার স্বপ্ন পূরণ হবে না। আগে থেকেই সাইবার ক্যাফে যাওয়া আসা ছিল। অনেকের ফেসবুকে একাউন্ট থাকায় সিদ্ধান্ত নিই কোনো অফ ট্যাকের কোনো সাইটে একাউন্ট খুলব। ডিজিটাল সেক্স বলে রেটটা একটু বেশি রাখি। এতে সুবিধা অনেক। কোথাও যেতে হয় না। একদিনে অনেক পুরুষকে সঙ্গ দিতে হয়ে না। এক ঘণ্টায় একজন পরপুরুষ সাধারণত দুইবারের বেশি মিলিত হতে পারে না। ফলে আমি সেক্সটা এনজয় করতে পারি। অনেক গল্প শোনালাম। আর না। এবার আমার টাকাটা দিন। সে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে। আমি বলি ছবির সঙ্গে আপনার মিল নেই। ওসবের দরকার নেই।' [হাসান শাফেয়ী ও কাজী সোহাগের রিপোর্ট, মানবজমিন ও অবাক বাংলাদেশ এর সৌজন্যে]

পাঠক! আশা করি পত্রিকার রিপোর্টটি পড়ে যা বোঝার তা বুঝে নিয়েছেন। হয়ত এই ভেবে আহত হচ্ছেন, পশ্চিমা সভ্যতার জীবন

বিধ্বংসী সুনামী কত নিপুণ মর্মান্তিকতায় আমাদের এই মুসলিম রাষ্ট্রটিকে জেঁকে ধরেছে। যে শিক্ষার আলোর আশায় দারিদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে সেই শিক্ষাই সাগরের ধ্বংসের উন্মাতাল ঝড়ে পালছেঁড়া তরীর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে!

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। দেয়ালে, বইয়ের পাতায়, ছেলেসন্তানদের পড়াশোনায় আগ্রহী করতে মা বাবাদের কথায়, বড়দের উপদেশ বাণীতে এবং পাঠ্যপুস্তকগুলোর শেষ পৃষ্ঠাসমূহে খুব যত্ন করে কথাগুলো লেখা থাকে। কথাটা সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন ও বিপ্লব আনতে হয়। একটি বৈপ্লবিক শিক্ষাব্যবস্থা ওই দেশকে বিশ্বমানচিত্রে বিশেষ স্থান ও মর্যাদা দখল করতে বিপুল ভূমিকা রাখে। এর সর্বশেষ প্রমাণ ইরান। বিশ্বমানচিত্রে ইরান আজ বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিশ্বের একমাত্র জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈল অনেক হম্বিতম্বি করলেও তারা জানে ইরান আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে তাতে তারা ইসরাঈলকে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সক্ষম।

ইরানের মতো একটা দেশের এই অবস্থানে পৌঁছা সহজ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল শিক্ষাবিপ্লব। এই বিপ্লবসাধন করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে। পাঁচবছর পর্যন্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-ইউনিভার্সিটি বন্ধ রেখে দেশের স্বার্থকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রণয়ন করে তবেই শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। এর ফলাফলও তারা আজ হাতেনাতে পাচ্ছে। শিক্ষাবিপ্লবের ফলে তারা

এমন কীর্তিবান ও সক্ষম নাগরিক তৈরি করতে পারছে যারা আমেরিকার রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন বিমান শুধু অবতরণ করাতেই সক্ষম হয়নি, অনুরূপ ড্রোন তারা নিজেরাও তৈরি করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে।

আমি ইরানের ধর্মীয় আদর্শের পক্ষে কথা বলছি না। জাতি ও দেশের কল্যাণ সাধনা-নিমিত্তে প্রণয়ন করা একটি শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে কত উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে শুধু সে কথাটা বলতে চাচ্ছি। যদি সে ভাবনার আলোকে বলি তবে বলতে হবে, আমাদের দেশেও শিক্ষায় বিপ্লব আনতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো চল্লিশ বছরের বেশি গত হলো, এর আগের শিক্ষা ছিল পাকিস্তান শাসনাধীন। তারও আগের শিক্ষা ছিলো বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত। ফলে দীর্ঘদিন আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লবের যুগান্তকারী ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাই সামর্থ্যে সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেশটিতে শিক্ষাবিপ্লবের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে স্রোতের গতিতে অনৈতিকতা, বেলেল্লাপনা।

সুতরাং আদর্শ ও দেশের সেবার মানসে একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুনধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে উঠেছে। যে শিক্ষার গোড়ায় থাকবে ইসলাম, দেশ ও মানবপ্রেম। থাকবে হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য রক্ষার দীপ্ত প্রতিজ্ঞা। আজ কেন শিক্ষালয় হয়ে উঠবে নাস্তিকদের আস্তানা? ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার বছর ধরে হাজার আলেম-উলামা, মুজাহিদীন-শহীদান ও ইসলামপ্রেমীর কুরবানীর নযরানায়

প্রতিষ্ঠিত দেশটিতে চর্চা হবে ইসলামবিরোধীতা? কেন শিক্ষালয়গুলো অনৈতিক নগ্নাচারের চর্চা হবে? কেন একজন নারীকে দেহের বদলায় শিক্ষা করতে হবে? কেন এই পরিবেশ সৃষ্টি হলো? কারা শিক্ষাঙ্গনকে অশালীন জিন্দেগির কালিমায় কলঙ্কিত করল? আজ উচ্চশিক্ষার জন্য একজন নারীকে কেন ফেসবুকে দেহ বিক্রির অফার করতে হবে?

শিক্ষাবিহীন একজন মানুষ দেশ ও সমাজের বিরাট বোঝা, একথা সত্য। কিন্তু এরচেয়েও বড় সত্য হচ্ছে একজন চরিত্রবান নারী এই ধরনের চরিত্রওয়ালা শিক্ষিত নারীর চেয়ে হাজারগুণ ভালো। শিক্ষা না থাকলেও চরিত্র দিয়ে এরা দেশের কল্যাণে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু যার শিক্ষা খরচ অর্জিত হয়েছে দেহদানের বদলায় সেই শিক্ষা দেশের কোন খাতে ব্যয়িত হবে? ওই নারী তার জীবনবোধের কোন গল্পের দায়ে দেশ ও মানুষের সেবা করবেন? তার মধ্যে তখন কাজ করবে ঘৃণা, জিঘাংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা। যে বাবা তাকে শিক্ষা খরচ থেকে বঞ্চিত করেছে, যে স্বামী তাকে অসহায় করে ফেলে চলে গেছে, যে পুরুষরা শুধু টাকার জোরে তাকে ব্যবহার করে গেছে হয়ত একে একে এদের সবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ক্রোধ ও জিঘাংসা জন্ম নেবে। যে সমাজ-সংসারের হাজারজনের বিরুদ্ধে জন্ম নিবে জিঘাংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা সেই সমাজকে তিনি কীইবা উপহার দেবেন?

এখানে আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়। ইসলাম আসার পূর্বে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ কামানোর রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সেটা

আজকের মতো এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল না। ব্যভিচারসংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাদীসগ্রন্থগুলো থেকে তৎকালীন পতিতাবৃত্তির কিছু ধারণা লাভ করা যায়। আয়াতটি হলো :

﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٣ ﴾ [النور: ٣]

'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।' {সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩}

আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্নগ্রন্থে অনেক বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। যেমন :

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»

সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবাইরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'মক্কায় ইসলাম আগমনের পূর্বে কয়েকজন (নয়জন) ব্যভিচারী ছিল (তারা বাড়ির সামনে লাল পতাকা টাঙিয়ে রাখত যাতে খদ্দেররা সহজে তাদের কাছে আসতে পারে)। কিছু লোক তাদেরকে বিয়ে করেছিল এবং তারা তাদের

অর্জিত অর্থের কিছু ওই স্বামীদের পেছনে খরচ করত। ইসলাম আগমনের পর মুসলিমদের কেউ কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিয়ে করাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।' [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা : ১৬৯৩২]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ، فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

'আয়াতটি নাযিল হয়েছে জাহেলী যুগের প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণীদের সম্পর্কে। এরা ছিল কিছু ব্যভিচারী মুশরিক মহিলা। আল্লাহ মুমিনদের জন্য এসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছেন। [সিয়ূতী, আদ-দুররুল মানছূর : ৬/১২৯]

তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রের বক্তব্যানুযায়ী ওই মহিলারা কেবল এলাকাকেন্দ্রিক পাপাচারে লিপ্ত হতো এবং তাদের দ্বারা সমাজের খুব কম সংখ্যক মানুষই খারাপ পথে পা বাড়াতো। উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণনা থেকে তেমনি প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন,

إِنَّمَا كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ

‘জাহেলী যুগে প্রকাশ্যে ব্যভিচারী কিছু নারী ছিল। তারা তাদের দরজার সামনে পতাকা ঝুলিয়ে রাখত, যাতে খারাপ লোকেরা বুঝতে পেরে তাদের কাছে আসতে পারে।’ [প্রাগুক্ত : ৬/১২৯]

কিন্তু জাহেলিয়াতের সীমাবদ্ধতার জাল ছিন্নভিন্ন করে মানুষ এগিয়ে গেছে অনেক দূরে- চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে, সাত সমুদ্রের নিচে আর ফেসবুকে প্রস্তাব দিয়ে ব্যভিচারি নারী পৃথিবীর সব নষ্ট পুরুষের কাছে! আনাকরা (মক্কার নয় ব্যভিচারিণীর একজন) জাহেলিয়াতের মূর্খতার সীমাবদ্ধতায় যা করতে পারেনি, আধুনিকতার রণসজ্জিত লোপারা আজ তা নির্বিঘ্নে করতে পারছে!

তবে এখনও কি সময় আসেনি আল্লাহর এই দান বিজ্ঞান ও প্রচার মাধ্যমকে প্রবৃত্তির কাজে ব্যবহার না করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার? আজ দাবি উঠছে সবাইকে এক সঙ্গে শোধরাবার। রাজনৈতিক, আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।

অনৈতিকতা আশ্রিত এই শিক্ষার বোঝা বহন করা সমাজের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠছে। তাই এই বোঝা কমাতে হবে, শিক্ষার হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র ভালো করার দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, শিক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি শিক্ষালাভের গুরুত্বও বয়ান করা হয়। এপর্যন্ত এসে অনেক মানুষ সত্য থেকে সরে যায়। প্রচলিত এই শিক্ষাব্যবস্থা নিছক ভবিষ্যত উপার্জনের মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও তারা ‘মনুষ্যত্বের জন্য শিক্ষা’ বলে গলাবাজি করে। অথচ এই কপটতা যদি না থাকত, শিক্ষাকে যদি

সত্যিই মনুষ্যত্বের মাধ্যম বানাতো তবে সমাজের চিত্র আজ এত কদর্য থাকত না।

অস্বীকার করার সুযোগ নেই, সমাজের ভয়াবহ পাপ, অন্যায়, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'শিক্ষিত' লোকদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। একজন অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালা না মেটানোর সুযোগ নিয়ে হয়ত পাঁচটাকা ভাড়া বেশি হাঁকান আর তাতেই আমরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। এই 'মহা অন্যায়ের' প্রতিবাদে তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করি। কিন্তু বাংলাদেশ ও বিদেশ থেকে পড়ে আসা একজন ডাক্তার যখন টাকা খেয়ে সদ্য ধর্ষিতার মেডিকেল টেস্টকে ভুয়া বলে সার্টিফিকেট দেন কিংবা একজন সচিব যখন নতুন মসজিদে বিদ্যুৎ সংযোগের ফাইল ঘুষের টাকার লোভে আটকে দেন, একজন এমপি যখন নিঃস্ব, অসহায় বৃদ্ধার বয়স্কভাতা কার্ডে ভাগ বসান তখন আমরা তা নিরবে হজম করি! এর কারণ কি একমাত্র এই যে, রিকশাওয়ালার ওই পাঁচ টাকার অনৈতিক দাবির জন্য বিনিয়োগ করতে হয়নি আর এদের অনৈতিকতার দাবিতে বিশাল বিনিয়োগ করা হয়েছে?

জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাই বুঝি মানুষকে এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর করে তোলে? আসলে একই সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমাজ ও পাঠকের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে, শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই মনুষ্যত্ব বিকাশের উৎস মনে করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নৈতিকতা ও ধর্মীয় জ্ঞানকে

গুরুত্ব দিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। আনতে হবে শিক্ষাখাতে কার্যকর বিপ্লব।

তা না করলে এই শিক্ষা মানবজাতির সমাধান তো দেবেই না, উল্টো এই শিক্ষাই পুরোজাতির গলার কাঁটা হয়ে আবির্ভূত হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মহৎ না হয়, শিক্ষাব্যবস্থা যদি নিছক জাগতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে গড়া হয়, তবে সেই শিক্ষা কী পরিমাণ অনৈতিকতার জন্ম দেয় তা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি লোপার এই গল্প পড়ে। আল্লাহর একটি বাণী উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٧٩ ﴾ [الاعراف: ١٧٩]

'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।' {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : ১৭৯}

## পুলিশি লাঞ্ছনা ও পশ্চাৎ ইতিহাসের অচেনা বাঁকে

পুলিশ জনগণের বন্ধু। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আপদ-বিপদের সাথী। এ ধারণা বাংলাদেশে ক্রমেই ম্লান হতে চলেছে। বিপদের সাথী দ্বারা এত বেশিমাত্রায় বিপদ সংঘটিত হচ্ছে, যাতে করে এধরনের ঘটনার চাঞ্চল্যতাও হারাতে বসেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে এধরনের একটি ঘটনাই গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস সচেতন যারা তারা নিশ্চয় ভুলে যাননি ১৯৯৪ সালের ২৫ আগস্ট পুলিশ কর্তৃক উত্তরবঙ্গের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা।

ইয়াসমিনের এই ঘটনা সেদিন শুধু পুলিশ ব্যারাককেই প্রকম্পিত করেছিল তাই নয়, ক্ষমতাসীনদের মসনদকেও করেছিল টালমাটাল। কিন্তু খাবারের আধিক্যে যেমন রুচি পড়ে যায়, শোকে শোকে পাথর, তেমনি ভয়ংকর এসব ঘটনার আধিক্য দ্বারা মানুষের ঘৃণাবোধেও এসেছে সহিষ্ণুতা। তাই আগের মতো আর বিক্ষুদ্ধ হয় না জনগণ, প্রতিবেশি মেয়েটার সর্বনাশেও বিগলিত হয় না মন! বস্তুত মানুষের ভাবনা যতই নিজ স্বার্থে সংকুচিত হচ্ছে, সমাজে পাপের ভয়াবহতা ততটাই সর্বত্র সংক্রমিত হচ্ছে। এই সংক্রমণের প্রভাব অন্য দশজনের মতো নাগরিকদের নিরাপত্তা ও নারীর ইজ্জত রক্ষার যিম্মাদার পুলিশের মধ্যেও হু হু করে বাড়ছে।

কিছুদিন আগে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কত ভয়ংকর তথ্য চিন্তা

করা যায়! যে শিশু একজন পুলিশের কাছে পিতার মমতায় নিরাপত্তা লাভ করার কথা, দরিদ্র নাগরিকদের ঘর্মাক্ত উপার্জনের বিরাট অংশ দিয়ে পুলিশকে অস্ত্র দেয়া হয়েছে নাগরিকদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য সেই অস্ত্রই তাক করা হয়েছে খোদ নাগরিকদের বিরুদ্ধে! তাও বড়-বয়স্ক কেউ নয়; একজন শিশুর বিরুদ্ধে!

সংশ্লিষ্ট পুলিশকে গ্রেফতার ও তার দায়িত্ব প্রত্যাহার করা হয় বটে, কিন্তু এ ধরনের গ্রেফতার এবং প্রত্যাহার করার পদক্ষেপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মনে হলেও পরবর্তীকালে অভিযুক্তের জন্য এটাই পুরস্কার বা খালাসের সূচক হয়ে ওঠে। কারণ, এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হয় কিংবা এতই মন্থর গতিতে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা চূড়ান্ত বিচারে শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালনে রূপ নেয়।

মুন্সিগঞ্জের ঘটনায় ষষ্ঠ শ্রেণির এই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ দৃশ্যত সত্য প্রতিভাত হওয়ার পরও সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া একটি অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। দেশের প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষ দিন দিন আস্থা হারাচ্ছে। এর একটা বড় কারণ, বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গ্রেফতার, জামিন নামঞ্জুর ও রিমান্ডের মতো চটকদার হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিবেক বলে আলামত সংগ্রহ, রিমান্ড আবেদন ইত্যাদির জন্য সময়ক্ষেপন না করে বরং অভিযুক্তের সাত

দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা জরুরী। নাগরিকদের সম্ভ্রমরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে সম্ভ্রম ধ্বংসের এসব ঘটনায় আমরা বিচার চাই, রিমান্ড চাই না।

## মুদ্রার অপর পিঠ

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া থাকে। এটা সর্বজনবিদিত তথ্য। বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের দায়িত্বশীল, যাদের হাতে সাধারণ নাগরিকের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার কুঞ্জি তুলে দেয়া হয় তারা যদি নাগরিকদের সঙ্গে খেয়ানত করেন তবে ওই সমাজে পাপাচার ও অন্যায়ের প্রবণতা বানের পানির মতো হু হু করে ঢুকে পড়ে। শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গুলিস্তা গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার জনৈক বাদশা তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভ্রমণে বের হলেন। ভ্রমণ বিরতিতে খাবারের আয়োজন করা হলো। কিন্তু খেতে বসে দেখা গেলো সঙ্গে লবণ আনা হয়নি। সৈন্যরা বললেন, এ আর কি সমস্যা? আশেপাশের কোনো বাড়ি থেকে একটু লবণ নিয়ে আসি। বাদশা ওই সৈন্যকে নিবৃত করলেন এবং বললেন, আজ বাদশা যদি তার প্রজার বাড়ি থেকে এক চিমটি লবণ আনে তবে পরেরদিন সৈন্যরা গরু ধরে আনবে! বাদশা বড় বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। তিনি মানব প্রকৃতির নাড়ি-নক্ষত্রও ভালো করে রপ্ত করেছিলেন। তাই পাপ বিস্তারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ধরন ভালো করেই জানতেন।

বাদশার দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন- ক্ষমতাশীলরা ছোটো অন্যায় করলে অধীনস্তরা বিপুল উৎসাহে এরচেয়ে বড় পাপে লিপ্ত হবে।

জানি না, শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহর উল্লিখিত ওই বাদশা মহোদয় কতদিন আগে রাজ্যশাসন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার শতভাগ বাস্তবায়ন সুদূর বাংলাদেশে বসে আমরা নিত্যনতুন রূপে প্রত্যক্ষ করছি। তাই তো যে পুলিশ বাহিনীর কাজ ছিল নারীদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাযত করা, তাদের কারো কারো দ্বারা সেই ইজ্জত-আব্রু দলিত হওয়ায় দেশে বিপুল উৎসাহে এই অপকর্ম বেড়ে গেছে। কিন্তু কামারের লোহার বাড়ির আঘাত যেমন সবার আগে তার কানকেই স্পর্শ করে ঠিক তদ্রূপ যারা পাপ ও অনাচার বন্ধের দায়িত্বশীল হয়েও যারা তা বন্ধ করার পরিবর্তে নিজেরাই তাতে জড়িয়েছেন তারাও শিকার হচ্ছেন এর নির্মম পরিণতির। এমনই এক নির্মমতার শিকার এক ফুটফুটে সুন্দরী কিশোরী মারজানা।

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার চরচালা গ্রামের শাহ আলমের ভাগ্নি আব্দুল মান্নানের মেয়ে মারজানা আক্তার ফাতেমা নিজ গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী। চাচা রফিকুল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার এসআই। তিনি সপরিবারে বসবাস করেন বাহুবল থানার কনস্টেবল কোয়ার্টারের দ্বিতীয় তলার ফ্লাটে। ঘটনার কয়েকমাস আগে মারজানা তার চাচার বাসায় আসে লেখাপড়া করার জন্য। সুন্দরী তরুণীর ওপর কুনজর পড়ে একই ভবনের বাসিন্দা কনস্টেবল রুহুল আমীনের ছেলে ফাহাদ হোসেন এবং বেতার কনস্টেবল আব্দুল কাদেরের ছেলে মাসুমের। তারা তাকে সময়ে অসময়ে উত্যক্ত করতে থাকে। বিষয়টি মারজানা তার চাচা, চাচি, মামা ও মা-বাবাসহ আত্মীয়স্বজনদেরকে অবহিত করেন।

এদিকে চাচা রফিকুল ইসলাম বদলি হয়ে চলে যান সিলেটের গোয়াইনঘাট থানায়। মারজানা বাসায় থেকে যান।

নিজ দেশ ছেড়ে সিলেটের ভূমিতে লেখাপড়া করতে আসা মারজানার জন্য চরম দুঃখ অপেক্ষা করছিল ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের দিনটি। ওই দিন রাত দশটার দিকে বিদ্যুতের লোডশেডিং শুরু হয়। ভ্যাপসা গরম থেকে রক্ষা পেতে চাচি কামরুন্নাহার কল্পনা কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে নিচে আঙিনায় পায়চারী করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজায় মাসুমকে দেখতে পান। বাসার ভেতরে মারজানার চিৎকার শুনে তিনি বাসায় প্রবেশ করে দেখতে পান বাসা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি মাসুমকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কামরুন্নাহার ডাকাডাকি করলে ফাহাদ দরজা খোলে। তাকে সম্পূর্ণ এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান কল্পনা। ভেতরে গিয়ে তিনি দেখতে পান মারজানা অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বাথরুমে প্রবেশ করছে।

কামরুন্নাহার অনেক ডাকাডাকি করে মারজানাকে বাথরুম থেকে বের করে আনেন। এসময় তিনি মারজানার গালে কামড়ের দাগসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের অসংখ্য চিহ্ন দেখতে পান। ঘরের মেঝে ও বিছানায় মারজানার অন্তর্বাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেন তিনি। মারজানা জানায়, বিদ্যুৎ না থাকায় খারাপ উদ্দেশ্যে ফাহাদ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাসুম পাহারা দেয়। এসময় ফাহাদ জোর করে

মারজানাকে ধর্ষণ করে। কামরুন্নাহার ঘটনার পর স্বামীকে অবহিত করেন।

পাঠক! পুলিশি পরিবারের পাশবিকতার এখানে শেষ নয়। এই পর্যন্ত যা ঘটেছিল তা খুবই নির্মম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর আরো যা ঘটেছিল তা আর আর যাই হোক, কোনো সভ্য সমাজের কাজ বলে মেনে নেয়া যায় না। আমরা ইতিহাসের অনেক ঘটনা সম্পর্কে জানি, যা শুধু শ্রুতিমধুরতার জন্য বলা হয় না, যুগ যুগ ধরে তা শিক্ষাপাথেয় হয়ে মানুষের বিবেকের দুয়ারে করাঘাত করে।

ইতিহাসের অমর নায়ক হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইবরাহিমী খড়গহস্তে আবির্ভূত অপ্রতিরোধ্য সুলতান মাহমুদ গজনবী রহিমাহুল্লাহর নাম শোনেননি এমন ব্যক্তি খুঁজে বের সহজ হবে না। তিনি ইতিহাসের হাজারও অমর ঘটনার নায়ক হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে অতি আপন হয়ে আছেন। মজলুম নারীদের চোখে আপন হয়ে আছেন চরিত্র ও সতীত্বের দুশমনদের বিরুদ্ধে আপোসহীন যোদ্ধার ভূমিকার কারণে।

একবার এক বৃদ্ধ পৌঢ় প্রজা আসলেন তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে। তিনি বললেন, মাননীয় সুলতান! আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার দরবারে আগমন করেছি। আপনার ভাগ্নে আমার কন্যার ইজ্জত হরণ করতে উদ্যত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটার ইজ্জত বাঁচিয়েছি আমরা। কিন্তু হয়ত সম্ভব হবে না তা। আবার হানা দেয়ার হুমকি দিয়ে সেদিনের মতো চলে গেছে সে। আশঙ্কা করছি খুব শীঘ্রই আবার হানা দেবে ও...

প্রজার অভিযোগ শুনে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠলেন ইতিহাসের এই অমর নায়ক, অকুতোভয় সাহসী সুলতান গজনবী। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদরক্ষীদের ডেকে বললেন, এই লোকটাকে চিনে রাখো। বৃদ্ধা যেদিন, যে সময় এবং যত রাতেই আমার কাছে আসুক, বিনা বাধায় তাকে আমার কাছে পৌঁছতে দেবে।'

এরপর সুলতান লোকটিকে বললেন, যদি কোনোদিন সে আবার হানা দেয় তবে দেখলেন তো আমি প্রহরীদের বলে রেখেছি বিলম্ব না করে আমার কাছে চলে আসবেন।

নিঝুম রাত। রাতের গভীরতায় প্রজাকুল নিদ্রাকোলে শায়িত। এই গভীর রজনীতে হঠাৎ সুলতানের খাসকামরায় বিশেষ প্রহরীর মৃদ করাঘাত শোনা গেল। হন্তদন্ত সুলতান বের হতেই প্রহরী সালাম দিয়ে জানালো, মুহতারাম সুলতান! ওইদিনের সেই লোকটি এসেছেন...

এরপর আর কিছু বলতে হলো না। সুলতান গজনবী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুতবেগে তার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন। বুকে তাঁর একটাই ভয়, আতঙ্ক- না জানি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব কিনা? উল্কাবেগে ওই মজুলম প্রজার আগে তার বাড়িতে পৌঁছলেন সুলতান। বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন লোকটির মেয়েটি বাঁচার জন্য কাকুতি মিনতি করছে, কিন্তু ক্ষিপ্র যুবকের মন গলছে না তাতে। সে পাশবিক হিংস্রতায় পরম সুন্দরী ওই কন্যাকে স্পর্শ করতে চাইছে। রাতের আঁধারে কালবিলম্ব না করে মহামহিম সুলতান খাপ থেকে তলোয়ার বের করে মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন

পাপোদ্ধ্যত যুবকের মস্তক। এরপর আলো জ্বালিয়ে মস্তক দ্বিখণ্ডিত যুবকের চেহারায় ঘৃণা ভরে নজর বুলালেন। নজর বুলাতেই সুলতানের চেহারায় আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো। তিনি উচ্চস্বরে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন এবং ওই লোকটির কাছে পানি চাইলেন।

কৃতজ্ঞতায় ওই পৌঢ়ের হৃদয় আনন্দে দুলছিল। তার মতো এক ক্ষুদ্র প্রজার বাড়িতে সুলতান এসেছেন, পানি পান করতে চাচ্ছেন, এসব কথা ভাবতেই তার বুকটা আনন্দে আরেকটু বড় হয়ে গেলো। তিনি দৌড়ে পানি আনতে গেলেন। সুলতান শীতল পানি পান করে আবার আলহামদুলিল্লাহ বললেন। মেয়েটির বাবা কম্পিত বুকে সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেন, সুলতানে আলা! যদি অনুমতি দেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। সুলতান তাকে নির্ভয়ে তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করলে লোকটি বললেন, মহামান্য সুলতান! আমি লক্ষ্য করেছি আপনি যুবকটির মাথা দ্বিখণ্ডিত করে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন এবং হত্যা করেই পানি পান করলেন...

সুলতান বললেন, শোনো, তুমি যেদিন বলেছিলে আমার ভাগ্নে তোমার কন্যার ইজ্জত হরণ করতে চায় তখনই আমার সারা শরীরে ক্ষোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানের আপনজন হয়ে সে এত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার কন্যার ইজ্জতের ওপর আঘাতকারীর ফয়সালা না করে ক্ষান্ত হবো না এবং এক ফোঁটা পানিও পান করব না। আমার ভয় ছিল হতে পারে আমার ভাগিনা এই কাজটি করতে

পারে। তাই তাকে হত্যা করে তার চেহারা দেখে নিশ্চিত হয়েছি আমার পরিবার বা আপনজনদের কেউ এই ঘৃণ্য পাপে জড়িত নয়। যুবকটি আসলে অন্য কেউ। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। আর পানি পান করলাম, কারণ তুমি বিচার দায়ের করার পর থেকে আজ পর্যন্ত পানি পান করিনি আমি। প্রচণ্ড পিপাসার্ত ছিলাম, এখন পিপাসা নিবারণ করলাম।

ভারতবাসীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভয়ানক ও আতঙ্কিত শাসকের নাম এই সুলতান গজনবী। তিনি হিন্দুদের সবচেয়ে তীর্থস্থান সোমমন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা ছিল হিন্দুদের দৃষ্টিতে অপারাজেয় এবং দুর্ভেদ্য। তা ভারতবাসী আজো ভুলতে পারে না সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথা। কিন্তু তবু কালের মহাকাব্যিক ইতিহাস রচনা করে সগৌরবে খোদ ভারতবাসীর মনে স্মরণীয় হয়ে আছে সুলতান গজনবীর নাম। এই ইতিহাস একজন বিশ্বখ্যাত মুসলিম শাসকের শুধু ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষীই নয়; মজলুম নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করারও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-আখ্যান হিসেবে দেদীপ্যমান।

গল্পে গল্প বাড়ে, বিশ্লেষণে আসে পশ্চাত ইতিহাসের মহাকাব্য। তাই জনগণের ঘামের টাকায় বেতন-ভাতা দেয়া এদেশের মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার পুলিশদের দায়িত্ব কী হওয়া দরকার এবং যাদের হাতে প্রজাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব তারা কীভাবে ইতিহাস সামলেছেন এবং মজলুম নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন তার উদাহরণ দিতে গিয়ে ঘটনাটি তুলে ধরলাম। এবার আসি আমাদের মূল প্রসঙ্গে।

সন্তানদের দ্বারা একদফা লাঞ্ছিতা হওয়ার পর মারজানার ভাগ্যে জোটে তাদের পিতাদের দ্বারা ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হওয়ার পালা। দুই কনস্টেবলের ছেলে মাসুম ও ফাহাদকে ঢেকে নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির করেন থানার ওসি আজিজুর রহমান সরকার, এসআই ওয়াহিদুর রহমান, কনেস্টবল রুহুল আমীন (ফাহাদের বাবা) এবং কনেস্টবল আব্দুল কাদের (মাসুমের বাবা) ও দুলাল। সবার উপস্থিতিতেই ওসি-দারোগার জিজ্ঞাসাবাদ চলে ধর্ষিতাকে। কুরুচিপূর্ণ, বিব্রতকর ও আপত্তিকর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয় মারজানাকে। এসময় তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ধর্ষিতার স্পর্শকাতর স্থান স্পর্শ করে শারীরিক নিপীড়ন করে। এক পর্যায়ে আজিজুর রহমান সরকার চা খাওয়ানোর কথা বলে মারজানার চাচিকে রান্নাঘরে পাঠায়।

এ সুযোগে আজিজুর রহমান সরকার ও ওয়াহিদুর রহমান মারজানাকে ছাদে নিয়ে যায়। সিঁড়িতে পাহারায় রেখে যায় রুহুল ও দুলালকে। কিছুক্ষণ পর কামরুন্নাহার ছাদে উঠতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। তিনি বাধা ডিঙিয়ে উপরে উঠে দেখতে পান আজিজুর রহমান ও ওয়াহিদুর রহমান জিজ্ঞাসার নামে মারজানাকে লাঞ্ছিত করছে। এতে তিনি তাদেরকে বাধা দিলে তারা তাকে ধমক দেয়। একপর্যায়ে আজিজুর রহমান ধর্ষণের আলামত দেখতে মারজানার কাপড়-চোপড় খুলতে চাইলে তা ছিঁড়ে যায়। এ অবস্থায় নিজের অবশিষ্ট সম্ভ্রম বাঁচাতে মারজানা ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েন।

আহত অবস্থায়ও মারজানার চিকিৎসা নিয়ে টালবাহানা করে মানুষ নামের এই পশুগুলো। ফলে মারজানা হাসপাতালেই মারা যান।

আসলে কালের আবর্তনে ভুলের সংজ্ঞা বদলায়; যেমন ভঙ্গ দর্পণে চেহারার রূপ পাল্টে যায়। তাই বলতেই হচ্ছে, ওসি আজিজুর রহমান সরকার, এসআই ওয়াহিদুর রহমান, কনেস্টবল রুহুল আমীন (ফাহাদের বাবা) এবং কনেস্টবল আব্দুল কাদের (মাসুমের বাবা) ও দুলাল ভুল করেনি (?), করেছেন মারজানা! কেন তিনি বিচার দিতে গেলেন? তিনি কি জানেন না, এটা সুলতান মাহমুদের জামানা নয়? এখানে বাস করে ঘাতক, খাদক আর পাষণ্ডদের দল? এখানে নির্যাতন করা যতটুকু অপরাধ, নির্যাতিত হওয়া তারচেয়েও বেশি অপরাধ! এখানে নির্যাতকের শাস্তি নিশ্চিত নয় কিন্তু নির্যাতিতার শাস্তি অবধারিত! মানবরচিত আইনের খবর ও দেয়ালে নির্যাতিতাদের ভাগ্যের লিখন পাঠ করতে জানেন না বলেই মারজানাদের এই দুঃখ!

তাই তিনি অপরাধীদের অভিভাবকদের কাছে বিচার পাওয়ার আশা করে হয়েছেন আশাহত, বঞ্চনাকে ভেবেছেন সান্ত্বনা এবং উপহাসকে ভেবেছেন বিচার বলে। শুধু তিনিই উপহাসের পাত্রী হননি, যে ভারতে পরধর্মের একজন নারীর ইজ্জত বাঁচাতে অত্যন্ত প্রতাশালী শাসক অপরাধের সাজা না হওয়া পর্যন্ত পানি পান না করার শপথ নিয়ে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই ভারতে এখন কোনো নারীর ইজ্জতও সংরক্ষিত

নয়। এমনকি বিচারকদের দ্বারাও অহরহ সংঘটিত হচ্ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা।

১৩ নভেম্বর '১৩ সালের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের খবরে প্রকাশ, হিন্দুস্তানের এক তরুণী একজন বিচারপতি কর্তৃক দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এটা সাধারণ একটা ঘটনা। হিন্দুস্তান এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার নগরীতে পরিণত হয়েছে। আমরা কেবল মুসলিম শাসকদের ইনসাফের স্মৃতিটুকুই পাঠ করি। কিন্তু শিক্ষা নিই কতটুকু? কেন কায়েম করতে পারি না এমন সমাজ, যেখানে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান হবেন ধর্ষিতার জামিন, তার রক্ষাকবচ ও ইজ্জতের আমানতদার?

## নাস্তিক্যবাদের প্রভাব ও একজন বর্ষার গল্প

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম এসেছিল অনেক আগে। এদেশে ইসলামের আগমন সুপ্রাচীন, সমৃদ্ধ ইতিহাস সেটা। লোকসমাজে বহুল প্রচলিত, সর্বপ্রথম বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ বিজয় করেন। কিন্তু বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের বহু আগ থেকেই এখানে মুসলিমদের বসবাস ছিল। সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগেই ব্যবসার সূত্র ধরে এদেশে ইসলাম এসেছিল। মুসলিমদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা এদেশের সকল প্রজার মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাই অসংখ্য হিন্দু, আর্য, ব্রাহ্মণ মুসলিম হতে থাকে। এমনকি ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু শাসকও বহু আগ থেকেই ইসলামের প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন।

পুনরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, 'চেরর (মালাবার) রাষ্ট্রের শেষ রাজা চেরামাল পেরুলাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন।' [বাংলার ইতিহাস : পৃ. ১৫৮]

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তার অভিষেক অনুষ্ঠানকালে তলোয়ার তুলে ধরে আরবীতে উচ্চারণ করতেন, 'মক্কা হইতে আমার পিতৃব্যের ফিরিয়া আসা পর্যন্তই আমি এই তরবারী ধারণ করিব।' [প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৮]

মুসলিমদের ত্যাগ-তিতিক্ষায় গড়া এই হিন্দুস্তানে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহভোলা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৃদ্ধি পেতে থাকল আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তির। এই তাগুতী শক্তির সবচেয়ে বড়

বিজ্ঞাপন হলো নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিক্যবাদের হাত ধরেই বর্তমান পৃথিবীর সকল তাগুতী শক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমকে নিশ্চিহ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে উঠেপড়ে লেগেছে। মুসলিম আজ দেশে দেশে নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও এদের খড়গহস্ত থেকে মুক্ত নয়। নব্বইভাগ মুসলমানের এই দেশে আজ নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ্যে আস্ফালন দেখাচ্ছে। দেশ ও জাতির দুশমন সাম্রাজ্যবাদীদের দোসররা এদেশে ইসলামের সমাধি রচনা করতে চায়। ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টিকালচার উৎখাত করে এই পবিত্র জমিনকে বানাতে চায় পাশবিক নৃত্যের রঙ্গমঞ্চে। প্রগতির ধুয়া তুলে দিতে চায় এইডস সভ্যতা। যার হাতিয়ার পর্দাহীন খোলামেলা নারী, উচ্ছৃঙ্খল নারী।

নাস্তিকতা কী? নাস্তিকতা হচ্ছে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করার শয়তানী মতবাদ। নাস্তিক্যবাদিরা আল্লাহ তা‘আলার অসীম ক্ষমতা, অপার কুদরত, সুবিশাল মালিকানা ও যাবতীয় গুণাবলী অস্বীকার করে। জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে অসম্ভব জ্ঞান করে। তাদের ধারণা, এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই। নাস্তিকদের মতবাদ হল, Nature nevar breaks her own law অর্থাৎ ‘প্রকৃতি কখনো তার স্বভাব ভঙ্গ করে না।’ একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সামনে রেখে তাদের জীবন পরিচালিত করে। এটা যে সর্বৈব মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বস্তুতঃ নাস্তিকরা সত্যের অপলাপকারী, সত্যে অবিশ্বাসী। তারা শুধু বস্তুবাদে বিশ্বাসী। বস্তুবাদের রূপই হল নাস্তিকতা। এই মতবাদের জনক হচ্ছে ডারইউন, হিউম, হেগেল, এঞ্জেলস, মার্ক্স প্রমুখ।

একজন স্রষ্টার প্রতীতি সমগ্র মানুষের রক্ত-কণায় মিশে আছে। এছাড়া সে নিজের মধ্যে বিরাট শূন্যতা অনুভব করে; শান্তির ঠিকানা খোঁজে পায় না। এটা তার চিরন্তন উদ্দীপনা। ‘স্রষ্টার পরিচয় লাভ’ সে উদ্দীপনারই বাস্তব ঠিকানা। কিন্তু যারা স্রষ্টার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হন, তারা অন্য কোনো কৃত্রিম জিনিসকে উপাস্যের আসনে বসান। একজন নেতা যখন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়ান, তখন তিনি সে কাজেরই পুনরাবৃত্তি করেন, যা একজন ধার্মিক নিজের মাবুদের জন্য রুকু ও সেজদার মাধ্যমে করে থাকেন। একজন কম্যুনিস্ট যখন কালমার্ক্স বা লেনিনের প্রতিমূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় চলার গতি কমিয়ে মাথা নত করে চলেন, তখন তিনিও নিজের ‘উপাস্য’ সমীপে আপন ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু নিজের বাবাকে ছেড়ে সন্তান যখন অন্যকে বাবা বলে ডাকে, বাবা তখন বড় রুষ্ট হন। এ রুষ্ট আচরণনীতি একজন নগণ্য মানুষের বেলায় যথার্থ হলে পরাক্রমশালী স্রষ্টার বেলায় কেন তা সঙ্গত হবে না! প্রকৃতি ও বিজ্ঞানে স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর অজস্র প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলছি। তদস্থলে কৃত্রিম জিনিস এমনকি স্বয়ং বিজ্ঞানকে উপাস্যের আসন দিচ্ছি। ‘Nature nevar breaks her own law’ তথা ‘প্রকৃতি ও বিজ্ঞান আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা

করছে’- এটি একটি পরাবাস্তব কথা। ‘আল্লাহ আছেন’ এই চরম সিদ্ধান্তটি যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, তেমনি ‘আল্লাহ নেই’ এই প্রকল্পটিও প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহকে অস্বীকার করা যেতে পারে, যেমন অস্বীকার করেছেন- লামর্ক, ওয়ালেস, ডারউইন, কালমার্ক্স, লেনিন- কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিধর্মী কোনো কিছু কোনোদিন প্রকাশ করতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে যাদের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞান সীমিত ছিলো, তারাই কেবল স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। গভীর জ্ঞানের দার্শনিকরা কখনো স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারেননি। ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, ‘সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর সুগভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের দিকে টানে।’

স্রষ্টা তো দূরের কথা- স্যার জেম্স জিন্সের মত একদল অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক এই বিশ্বলোকের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। আর সৃষ্টিকে অস্বীকার করলে স্রষ্টার অস্তিত্বও ঠিক থাকে না। তারা বলেন, বিশ্বলোক ও তার বস্তুনিচয় কল্পনামাত্র। তাদের ভুল ভাঙ্গনের জন্য লোহার শলাকা তাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, ভাই, ব্যথা পেয়েছেন? যদি বলে হ্যাঁ, তবে এই তো বাস্তব জগত। নয়ত আপনি ব্যথা পেলেন কেন? আরেক দল নাস্তিক বা প্যাগানবাদী বিশ্বলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার একজন স্রষ্টা ও পরিচালক থাকার কথা স্বীকার করতে রাজী নন। তারা বলেন, সম্পূর্ণ শূন্য থেকে স্বতঃই বিশ্বের অস্তিত্ব জেগে উঠেছে এবং আপনা আপনি তা পরিচালিত হচ্ছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যাবিদ, অধ্যাপক

এডউইন বলেছেন, ‘দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভ এবং স্বতঃই তা বিন্যাসিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো ছাপাখানায় বিস্ফোরণের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যাসিত হয়ে একটি বিরাট অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।’

নভোমণ্ডল বিষয়ক অধ্যয়নে খগোলবিদদের থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরে যত বালুকণা আছে, সম্ভবত মহাশূন্যে সে পরিমাণ তারকা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু তারকা এত বড় যে, তার মধ্যে লক্ষ পৃথিবী, কোনোটিতে কোটি পৃথিবী সঙ্কুলান হতে পারে। এই বিশ্বলোক এতই বিশাল, আলোর মত তীব্র গতিশীল কোনো আকাশযান যদি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে বিশ্বলোকের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে, তবে সমগ্র দূরত্ব অতিক্রম করতে সম্ভবত এক হাজার কোটি বছর লাগবে! পিলোমার ওপর স্থাপিত এযুগের সবচে’ দূরদর্শনের টেলিস্কোপে চোখ রাখলে কয়েকশ’ কোটি তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র বিশ্বলোক এরকম অগণিত অগণন নক্ষত্রের চাকে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একেকটি ‘চাক’কে বলা হয় গ্যালক্সি বা ছায়াপথ। এ ছায়াপথগুলো ক্রমাগত আবর্তনমুখর।

চাঁদ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীর চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। আর পৃথিবী সূর্যের চারপাশে তার পরিক্রমা পূর্ণ করছে সাড়ে নয় কোটি মাইল দূর থেকে। এভাবে পৃথিবীসহ নয়টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে নিরন্তর দৌড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এসবের চারপাশে একত্রিশটি চাঁদ নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। তদুপরি

শত সহস্র ধূমকেতু ও সংখ্যাতীত উল্কামালা একই রকম আবর্তনে লিপ্ত। এসবকে অধীনে রেখেছে সূর্য। তার ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় বারো লক্ষগুণ বড়। এ সূর্য নিজের সমগ্র গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জসহ বিশাল এক গ্যালাক্সির মধ্যে ঘণ্টায় ছয় লক্ষ মাইল গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। আর প্রতিটি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের মধ্যে বিপুল গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জ বেষ্টিত সূর্যের মত একলক্ষ বিলিয়ন কিংবা তার কিছু কম-বেশি নক্ষত্র রয়েছে।

মহাকাশবিদদের অনুমান মতে- সমগ্র বিশ্বলোকে এজাতীয় প্রায় পাঁচশত মিলিয়ন ছায়াপথ আছে। আমাদের সৌরলোকের ছায়াপথটি এমনভাবে পরিভ্রমণ করছে যে, বিশ কোটি বছরে তার একবারের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। আমাদের এই ছায়াপথ আবার যে ছায়াপথের অংশ, তার ব্যাস বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। এটিও নিরবচ্ছিন্ন গতিবান। মহাশূন্যের এসব সৃষ্টি নিতান্ত সুসংহত। তাদের গতি ও আবর্তন বড় নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল। তাদের গতিতে কোনো ব্যাঘাত নেই; পরস্পরে কোনো সংঘর্ষ নেই। এই অথৈ অন্তহীন বিস্ময়কর সুসংবদ্ধতা দেখে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ককে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে- এসব স্বতঃই সৃষ্ট এবং স্বয়ংচালিত নয়; বরং কোনো মহাশক্তি তা সৃষ্টি করে এ অন্তহীন ব্যবস্থা কার্যকর রেখেছেন। সেই সঙ্গে সুস্থ মস্তিষ্ককে স্বীকার করতে হবে- এসব এবং তার শিরোবিন্দু মানুষ সৃষ্টির পেছনে সেই মহাশক্তিধর স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখেছেন, 'যে মানুষ নিজের এবং

অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন জ্ঞান করে সে কেবল হতভাগা নয়, অধিকন্তু তার জীবন মূল্যহীন।'

স্রষ্টায় কতিপয় অবিশ্বাসী প্রশ্ন তোলেন- এই বিশ্বলোক কোনো স্রষ্টার সৃষ্টি হলে তবে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? প্রখ্যাত বৃটিশ গাণিতিক বাট্রান্ড রাসেল এই জবাব খুঁজে পাননি বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'আল্লাহ' বলে কিছু নেই। এর মানে বিশ্বমণ্ডলের স্রষ্টা মেনে নিলে অবশ্যই তাকে অনাদি মেনে নিতে হবে। আর স্রষ্টাকে অনাদি মেনে নিলে বিশ্বলোককে অনাদি মানতে সমস্যা কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের এই থিওরি ভুলের দুর্বল ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা সৃষ্টিকর্তা বা শাশ্বত মেনে নেয়ার মত কোনো 'বিশেষত্ব' এই বিশ্বলোকের মধ্যে আজো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তদুপরি ঊনবিংশ শতাব্দির পর আবিস্কৃত 'Nature and science speak about Allah' তাপ-গতির দ্বিতীয় সূত্রটি তাদের যুক্তি-পদ্ধতির দুর্বল ভিতটি বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

তাপ-গতিবিদ্যার এ সূত্রটি বলছে, তাপ অনবরত নিম্ন তাপের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু তার বিপরীত দিকটি অসম্ভব- অর্থাৎ নিম্নতাপ থেকে উচ্চতাপের দিকে সংক্রমিত হওয়া। সুতরাং প্রমাণিত হলো- এই বিশ্ব তাপ বিকিরণ করতে করতে ক্রমশ: নিম্ন তাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি সময় আসা অনিবার্য, যখন তাপশক্তি বলে আর কিছু থাকবে না। এ বিশ্বলোক যদি সত্যই অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান থাকত, তবে এ অসীম সময়ের ব্যবধানে এতক্ষনে বিশ্বের সে অবস্থা ঘটত এবং পৃথিবীতে এক্ষণে কোনো জীবনের মৃদু

স্পন্দনও বাকি থাকত না। কিন্তু তেজস্বী সূর্য ও প্রাণ-সমৃদ্ধ পৃথিবী প্রমাণ করছে, বিশ্বজগত একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। তাপ-গতির এই নবতর আবিস্কারের উদ্ধৃতি দিয়ে আমেরিকার প্রাণী বিজ্ঞানী Second  low of thermo-dynamic বিশ্বলোকের নিজেস্ব 'সূচনা' থাকার কথা প্রমাণ করেছেন। আর বিশ্বের সূচনা ও সৃষ্টি হওয়ার কথা প্রমাণিত হওয়ায় একজন সূচনাকারী ও স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বতঃফূর্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যেমন কোনো লেখা দেখলে একজন লেখকের অস্তিত্ব স্বতঃই উপলব্ধিতে আসে।

কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণের উপর চরম ও সন্দেহাতীত যে প্রমাণটি বিদ্যমান তা হলো- যুগে যুগে স্রষ্টার অগণিত সাক্ষী তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। আপনি হয়ত বলবেন তারা মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু তাদের পূর্বাপর নিষ্কুলষ জীবন-চরিত পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মিথ্যুক বলার কোনো অবকাশ থাকে না। একথাও বলা চলে না যে, তারা ভ্রমে ছিলেন। কারণ দশ-বিশজন কিংবা একশ'-দুশ' জন লোক হয়ত ভ্রমে থাকতে পারেন, কিন্তু ১০০ হাজারেরও বেশি মানুষ কিভাবে ভ্রমে থাকেন?!

অবশেষে বেদনার্ত হৃদয়ে বলবো, এ পার্থিব জগতকে বেতালভাবে ভোগ করার বাসনা বিলাস থেকে স্রষ্টাকে অস্বীকারের প্রবণতা আজ বড় বেড়ে গেছে। কিন্তু অবিশ্বাসী নাস্তিকদের জেনে রাখা উচিত, এ জীবনের উচ্ছ্বাসিত কল্লোল একদিন থেমে যাবে। তখন অন্তিম মুহূর্তে ফ্যারাডের মত স্রষ্টাকে স্বীকার করার সুযোগ হয়ত নাও হতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক ও পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আমরণ

সৃষ্টি সম্পর্কে নিজস্ব থিওরি গড়ে তোলেন। ১৮৬৭ সালের কোনো একদিন মাইকেলের অন্তিম মুহূর্তে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেলেন, ফ্যারাডে! জীবনসায়াহ্নে তোমার মতবাদ কী? -মতবাদ? না, এখন আর আমার নিজস্ব কোনো মতবাদ নেই। আল্লাহকে ধন্যবাদ। আমি আজ প্রকৃত সত্য জানতে পেরেছি!

সত্য কথা হলো আল্লাহকে কেউ যদি জোর করে অস্বীকার না করে, খোলা মন নিয়ে যদি বিশ্বচরাচরে দৃষ্টিপাত করে তাহলে তার কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। আল্লাহ যেমন বলেছেন,

﴿ لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ ﴾ [الانبياء: ٢٢]

‘যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।’ {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ২২}

(মুফতি মাকসুদুর রহমান আল-মারূফের প্রবন্ধের সৌজন্যে)

এভাবে নাস্তিকরা জীবনসায়াহ্নে এসে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করছে জীবদ্দশায় গোটা সমাজকে করতে থাকে কলুষিত। কারণ বিশ্বাসগতভাবে নাস্তিকরা বহুভাগে বিভক্ত হলেও রসুনের গোড়ার মতো সব নাস্তিকের চিন্তা এক জায়গায় মিল। আর তা হচ্ছে অবাধ নগ্নতা এবং পশুসম অশ্লীলতা। একটা পাঠা খুব সম্ভব তার মায়ের

কাছে যায় না। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ এমন এক জঘন্য মতবাদ, যেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এটা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বড় কুফল। নাস্তিকদের দৃষ্টিতে সবকিছুই প্রাকৃতিক। তাই অন্য একটা মেয়ে যেমন প্রকৃতির মেয়ে, তেমনিভাবে তাদের চোখে মা, বোন, খালা এমনকি মেয়েও প্রকৃতির একটা মেয়ে। অতএব, দৈহিক সম্পর্কের বিবেচনায় সকলেই সমান! নাস্তিকদের চরিত্র, তাদের লেখা, আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের এই হলো প্রতিচ্ছবি। নাস্তিক্যবাদের কুফল অনেক। ব্যভিচারকে ব্যাপকতা দেয়া নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে ছোট ও সাধারণ কুফল! আজ দেশে যেনা-ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া, পাপকে পাপ মনে না করার মহামারি দেখা দিয়েছে। এর বহুমাত্রিক কারণের অন্যতম হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের চর্চা। সমাজ ও জীবনব্যবস্থা ধ্বংসকারী এই মতবাদ গুঁড়িয়ে না দিলে দুর্ভোগ আবশ্যক। কিন্তু উল্টো চলছে নাস্তিক্যবাদের পৃষ্ঠপোষণ, তোষণ ও লালন-পালন!

**ঘটনা :** বর্ষা। একটা মেয়ের নাম। সরাসরি সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিল এবিসি এফএম রেডিওতে। সাক্ষাৎকারে অকপটে বলে গেল জীবনের কথা। চাতুরি বা গোপন করার চেষ্টা করেনি মেয়েটি। লোকেরা তাই বলে মেয়েটা বেশ দুর্দান্ত সাহসী, অকুতোভয়!

বর্ষা তার জীবনকাহিনীর যে চিত্র উপস্থাপন করে তা সত্যিই হৃদয়বিদারক এবং অকল্পনীয়। হৃদয়বিদারক দেশের জন্য, দেশের নৈতিক অবস্থা এবং পাপাচার সহনীয়তা পাওয়ার জন্য।

বর্ষা জানায়, ঢাকায় বসবাসকারী তার পরিবার বেশ সম্পদশালী। সংসারে সৎমা আছে তার। এক খালা চট্টগ্রামের বাসিন্দা। মা-বাবা তাকে খালার কাছে চট্টগ্রামে পাঠায়। খালার বাসায় সে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। একদিন খালু তাকে বলে, বর্ষা! আমার না একটা বাচ্চা হবে এবং তা তোমার গর্ভে! কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ে বর্ষা। তা জানায় খালাকে। কী অদ্ভুত! খালা বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে বরং স্বাভাবিক স্বরে বলে, তাতে অসুবিধা কোথায়? তুই জানিস যে, তোর খালার সন্তান হচ্ছে না, তুই না হয় একটু আমাদের উপকার করলি, আমার হয়ে তুই তোর খালুর সন্তানটা পেটে ধারণ করলি, তাতে সমস্যা কোথায়!

খালা-খালুর কথাগুলো তীব্রভাবে বিদ্ধ হয় বর্ষার বুকে। কিন্তু উপায়হীন সে। কারণ, মাবাবা তাকে এখানেই রাখবেন। এই অক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নিলেন খালা-খালু। মেয়েটাকে নেশায় অভ্যস্ত করলেন। একদিন নেশাকাতর মেয়েটির গর্ভে আপন খালার ইশারা ও সমর্থনে খালু তার ঔরস স্থাপন করলেন। বিষয়টি টের পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেল বর্ষা। গর্ভ ধারণের প্রায় ছয় মাস পর বান্ধবীদের সহযোগিতা নিয়ে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে সে। এরপর কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকায় চলে আসে।

খালার পর এবার ফাঁদ পাতেন সৎমা। একদিন সৎমা তাকে চাকরি দেবেন বলে এক চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যান। চেয়ারম্যানের পছন্দ হয় বর্ষাকে। প্রথম দিনই হাতে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আগামীকাল আমরা ব্যবসায়িক কাজে কক্সবাজারে যাবো।

মতিঝিলে থেকো, তোমাকে অমুক মহিলা গাড়িতে তুলে নেবে। বর্ষার খটকা লাগল মনে। সে একজন সদ্য অভিজ্ঞতাঋদ্ধ মেয়ে। কিন্তু কী এক মোহে সে শঙ্কিত হয়েও বাধা দিতে পারে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে মতিঝিলে দাঁড়ায় বর্ষা। মধ্যবয়সী এক মহিলা তাকে রিসিভ করে। তিনজন রওয়ানা হয় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে।

এক দামি হোটেলে ওঠে তারা। শুরু থেকে হোটেলে ওঠা পর্যন্ত সবকিছুই সন্দেহজনক মনে হয় বর্ষার কাছে। এসব ঘটনার সঙ্গে ব্যবসার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পায় না সে। হোটেলকক্ষে একাই কথাগুলো ভাবে বর্ষা। চিন্তিত হয় ভীষণভাবে। চিন্তায় ছেদ ঘটাতে মধ্যবয়সী মেয়েটি তার কক্ষে প্রবেশ করে ভূমিকা ছাড়াই বলে, বর্ষা! জানো, তোমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন? স্যারের সঙ্গে সেক্স করতে হবে! কথাগুলো শুনে মূষড়ে পড়ে বর্ষা। তার চিন্তা কমাতে মহিলা বলে, তুমি চিন্তা করো না। স্যার কাউকে একবারের বেশি ব্যবহার করেন না। তুমি এখান থেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

এরপর ঢাকায় ফিরে আসে বর্ষা। বাড়িতে এসে ভর্ৎসনা পায় মা, বাবা এবং গোটা সমাজ থেকে। জিদ চাপে তার। সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহী হয়ে শরীর বিক্রি করার কাজে নেমে পড়ে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশের মিডিয়াগুলো জাতিকে বেহায়া ও নগ্নাচারী হতে ভয়ানকভাবে উৎসাহিত করছে। যারা সাক্ষাৎকার দিতে আসে তাদের কাছ থেকে খুটিয়ে বের করছে শারীরিক সম্পর্কের কথা, কীভাবে হলো, কতবার হলো, কেমন অনুভূতি হলো- এসব প্রশ্ন করে বক্তা ও শ্রোতার সামনে ব্যভিচারকে একটা

সাধারণকর্ম হিসেবে দেখাতে চায়। তাদের এই আচরণে যেনা-ব্যভিচার এখন অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্ষার কাছ থেকে উপস্থাপক খুঁচিয়ে বের করেন, সে এপর্যন্ত প্রায় ১০০০ যুবকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ‘ইনকাম’ করেছে।

জীবনের এই ‘ভাঙাকুলা’ সচল রাখতে ইয়াবা ধরেছে। এমনকি এক যুবক তাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হাজার হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। অনেক যুবক তাকে ভালোবাসার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অভিসার সমাপ্ত করে কলঙ্কিত এই মেয়েটির দিকে কেউ আর ভ্রূক্ষেপ করেনি। মাঝখানে সে ভালো থাকতে তিনমাস সব অনৈতিক কাজ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু তখন নাকি সে কারো কাছ থেকে ভালো থাকার সাপোর্ট পায়নি। বাড়ির লোকজনও তাকে আর সাধারণভাবে গ্রহণ করেনি।

এভাবে অকপটে বর্ষা তার জীবনের গল্প লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে দ্বিধাহীন, সংকোচহীনভাবে উপস্থাপন করে গেল। পরের সপ্তাহে জমা পড়ল প্রায় আশিজন যুবকের আবেদন। তারা সবাই বর্ষাকে বিয়ে করতে চায়! জানি না, এটা কি ‘লিলখবীছিনা আলখবিছাত’, নাকি সহমর্মিতা কিংবা তাউস, সুলায়মান হাম্বলীর মতো খারাপ মেয়েদেরকে নিজের বুজরুকি দিয়ে ভালো করার চেষ্টা!

যেটাই হোক না কেন, বর্ষার অনেকগুলো ঘটনা আয়না হয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থার নগ্নতা প্রকাশ করে দেয়। একটা সমাজ কী পরিমাণ দেউলিয়া হলে এভাবে একটা ব্যভিচারী মেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শ্রোতা বানিয়ে তার ব্যভিচারের কাহিনী প্রকাশ করে তা

সহজেই অনুমেয়। আর একটা সমাজ কত নিচুতে নামলে একজন খালা আপন ভাগ্নির গর্ভে নিজ স্বামীর ঔরস রাখতে উৎসাহিত করে তাও এই ঘটনায় স্পষ্ট।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অশ্লীলতাসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা যতই সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হচ্ছি; সমাজ-সংসারের কর্তাবাবুগণ ততই উদাসীনচিত্তে সবকিছু এড়িয়ে চলছেন এবং অকপটে হজম করে নিচ্ছেন। নারী নিয়ে সবচেয়ে বড় হোলি খেলা দেখালো নাস্তিক্যবাদের দোসররা। নারীদেরকে কীভাবে প্রকাশ্য রাজপথে জনসাধারণের খাদ্যে পরিণত করতে হয় তাও দেখিয়ে গেল ওরা কর্তাবাবুগণের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে। এতদিন মানুষ নাস্তিক্যবাদকে কেবলই স্রষ্টাদ্রোহী বলে জেনে এসেছে। কিন্তু ওরা যে নগ্নদস্যু ও চরিত্রবিধ্বংসী অভিসারীদল, সেটা ঘটা করে প্রকাশ পেলো সাম্প্রতিক সময়ের ওদের কর্মকাণ্ডে। তাই নাস্তিক্যবাদ কেবল আল্লাহর দুশমনই নয়, নারী ও সতীত্বেরও দুশমন। সমাজ ব্যবস্থা ও শান্তি-সম্প্রীতির জন্য এরা মারাত্মক বাধা। এই বাধার শিকড় না কাটলে নারীদের জন্য তাদের সতীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। হায় যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত শত্রু-মিত্র চিনতে পারত! আল্লাহর বাণীর অর্থ যদি বুঝত! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ

وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ [البقرة: ٢٢١]

'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। **তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন** এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১}

## নারীর অর্থোপার্জনের অধিকার ও বিজ্ঞাপনে পণ্য নারী!

ফ্যাঙ্ক বুকম্যান বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সবার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে বটে কিন্তু সবার লোভ মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।'

এই সর্বগ্রাসী লোভের কারণে সমাজে নীতিবোধ হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত, মূল্যবোধ হচ্ছে বিধ্বস্ত। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বণিকশ্রেণির সর্বগ্রাসী লোভের সবচেয়ে নির্মম শিকার হচ্ছে আমাদের নারীসমাজ। সমান অধিকার, নারীস্বাধীনতা ও স্বাবলম্বী করার নামে নারীদেরকে কত সূক্ষ্মভাবে যে প্রতারিত করা হচ্ছে হতভাগা নারী তা আঁচই করতে পারছে না। লম্পট, লুটেরা নারীর সামনে চাণক্যময় এই শব্দগুলোর মুলা ঝুলিয়ে রেখে তাদের চূড়ান্ত সর্বনাশসাধন ও নারীসত্তাকে দেউলিয়া করে ফেলেছে। ফলে আজ নারীকে তার সমহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার আহ্বান জানালে, গৌরবদীপ্ত স্বকীয়তায় প্রস্ফূটিত হওয়ার আকুলতা জানালে এই বণিকশ্রেণি তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। নারীর অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে বলে সব শিয়াল মিলে হুক্কা হুয়ার সুরে গান ধরে।

আমি যতদূর অনুধাবন করতে পারি, যে নারীর অধিকার নিয়ে এই শ্রেণি হইচই বাঁধায় সেই নারীসমাজ কিন্তু ইসলামের আদর্শকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে সাংঘর্ষিক কিংবা জীবন-জীবিকার প্রতিবন্ধক মনে করছে না। বরং লুটেরা নারীর সামনে প্রতিবন্ধকতার কৃত্রিম জলছাপ আঁকছে। আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না যে, যারা তথাকথিত নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার তারা কোনো না

কোনোভাবে নারীকে ব্যবহার করছে মাল কামানোর জন্য। কেউ ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার মালিক, যাদের ব্যবসার মূলভিত্তি হচ্ছে বিবস্ত্র-অর্ধবিবস্ত্র নারীর উদ্বাহু নৃত্য। কেউ প্রিন্টমিডিয়ার মালিক, যাদের পত্রিকার কাটতির জন্য চাই আবেদনময়ী উলঙ্গ নারীর নোংরা ছবি। কেউ হোটেল-মোটেলের মালিক, যাদের গ্রাহক ও বোর্ডার টানতে চাই রূপসী ললনাদের ছবির লম্বা লম্বা এ্যালবামের বই। আর কেউ বা বণিক, যাদের পণ্য বিস্তৃতির সওদা হিসেবে চাই নারীর সম্ভ্রম-সম্মান। উদাহরণস্বরূপ একটি তথ্য উল্লেখ করি।

পণ্যের প্রচার-প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন বিজ্ঞাপন। বণিকরা এবার বিজ্ঞাপনের অভিনব এক স্পট আবিষ্কার করেছে। পত্রিকায় প্রকাশ, জাপানি কোম্পানিগুলো এই বিজ্ঞাপনের উদ্যোক্তা। বলা যায়, এর চেয়ে খেকারে বিজ্ঞাপন স্পট আর হতে পারে না। এ স্পট চুম্বকের মতো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। বিজ্ঞাপনের এই  আকর্ষণীয় (?) স্পটটি হচ্ছে যুবতীদের উরু! এখন পণ্যের বিজ্ঞাপন স্পট হিসেবে যুবতীদের উরু ভাড়া দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং কোম্পানির বিজ্ঞাপন স্পট হিসেবে উরু ভাড়া দেয়ার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে জাপানি যুবতীরা। জেট্টাই রায়োকি পিআর নামের এক কোম্পানি এ বিজ্ঞাপন সার্ভিস জনপ্রিয় করা এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড কোম্পানির কাছে উপস্থাপন করার কাজ করে যাচ্ছে। জেট্টাই রায়োকি শব্দের অর্থ হচ্ছে পরম ‘আকর্ষণীয় এলাকা’ তথা অত্যন্ত গোপনীয় শূন্যস্থান। শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে মহিলাদের মিনি স্কার্ট বা শর্টসের নিচে এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা মোজার ওপরের উরুর অংশ।

যুবতীদের স্পর্শকাতর এ আকর্ষণীয় অংশটাই বিজ্ঞাপনের জন্য ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা করছে কোম্পানিটি। কোম্পানির দাবি, বিজ্ঞাপনের জন্য উরু ভাড়া দেয়া জাপানের যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। বেশ কিছু মহিলা এতে অংশ নিয়েছে। এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড কোম্পানি ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে সব যুবতী এক বা একাধিক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এ সংযুক্ত তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য রিক্রুট করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। কমিশন পেতে দিনের অন্তত আট ঘণ্টা একটা স্টিকার উরুর ওপর লাগিয়ে রাখতে হবে। এর ছবি তুলে তাদের পছন্দের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নতুন অ্যাকসেসরির জন্য পাঠাতে হবে।

এ চাতুরতামূলক গেরিলা বিজ্ঞাপন সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রায় ২,৮০০ জাপানি যুবতী এ সোশ্যাল মিডিয়ায় রেজিস্ট্রেশন করেছে। ফেইসবুকে গড়পরতা ৩৩০ জন বন্ধু জুটেছে।

জাপানি মেয়েরা তো এমনিতেই খাটো। তার ওপর শর্ত করা হয়েছে, দর্শকদের আকর্ষণ অটুট রাখার জন্য হাঁটুর নিচের অংশে মোজা পরিধান করতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের লেখা কিংবা ছবি যথার্থভাবে দৃশ্যত করানোর জন্য কাপড়ের ওপরের দিকে কতটুকু যে উঠানো লাগে তা কে জানে!

তাহলে চিন্তা করুন, নারীর সম্ভ্রম এরা কত নিচুতে ঠেকিয়েছে। এবং এটাও ভাবুন, নারীর এই চূড়ান্ত সর্বনাশ দেখে মনুষ্যত্বের অব্যর্থ সংবিধান ইসলামের কথা বললে এদের গা জ্বালা শুরু হয় কেন? বাংলাদেশে কত স্থানে কত ভয়াবহ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

সেগুলো নিয়ে নারীবাদীদের কোনো মাথা ব্যথা দেখা যায় না। তখন তাদের মানবতাবোধ ও নারী অধিকারের কথাও স্মরণ হয় না। তখন হইচই করবে কেন? তবে যে থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়বে!

আক্ষেপ! নারীদের ইজ্জত-আব্রু এবং তাদের শরীর-দেহ এভাবে বিকিকিনি করার জন্যই তো বণিকদের এত সাধনা, উন্মাদীয় আস্ফালন। কিন্তু নারীরা কি তাদের পাতা ফাঁদে পা দেবে, না দেয়া উচিত? মনে রাখতে হবে, সম্ভ্রম নারীর, তাই রক্ষার দায়িত্বও তাদেরই। আর তা রক্ষায় ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শের বিকল্প নেই।

নৃতাত্ত্বিক ড. অতুল সুর লিখেছেন- ‘প্রাণিজগতে মানুষই একমাত্র জীব, যার জৈবিক চাহিদা সীমিত নয়। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রেই সন্তান উৎপাদনের জন্য জৈবিক মিলনের একটা বিশেষ ঋতু আছে। মাত্র সেই ঋতুতেই তাদের মধ্যে শারীরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তারা স্ত্রী-পুরুষ একত্রে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এরূপ কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই। মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের বাসনা সব ঋতুতেই জাগ্রত থাকে। এ জন্য মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে দেখা যায়।’

বস্তুত মানুষের মধ্যে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা স্ত্রী-পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষের মধ্যে পরিবারের উদ্ভব হয়েছে। এটি আল্লাহরই বিধান এবং আল্লাহই এ নিয়ম প্রবর্তন করেছেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ [النساء: ١]

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক প্রাণ থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১}

আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم: ٢١]

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' {সূরা আর-রূম, আয়াত : ২১}

পরিবার গঠন করে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে থাকার অবশ্য আরো কারণ আছে। সেটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বা জীববিজ্ঞানজনিত কারণ। শিশুকে লালন পালন করে স্বাবলম্বী করে তুলতে অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অনেক বেশি সময় লাগে। এ সময় প্রতিপালন

প্রতিরক্ষণের জন্য নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়। মনে করুন অন্য প্রাণীর মতো মেলামেশার অব্যবহিত পরেই স্ত্রী-পুরুষ যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো, তবে মা ও সন্তানকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত। সন্তানকে লালন পালন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য মানুষের যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীবনজনিত কারণেই এ কথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে সেই আদিম যুগ থেকেই পুরুষ বাইরে আর নারী নিযুক্ত থেকেছে গৃহকর্মে। এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ হেকমত। তিনি এই হেকমতের মাধ্যমেই দুনিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন।

নারীকে আজ শ্রমবিভাজনের নামে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, নারীর ঘরের কাজ সম্মানজনক নয়, সম্মানজনক হচ্ছে বাইরের কাজ, অর্থোপার্জন। কিন্তু অতুল সুরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হয়, নারীর এই গৃহকর্ম মোটেই ছোটো কিংবা অসম্মানের নয়। বরং মানবসভ্যতার ধারা অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য তা নিতান্তই অপরিহার্য। নারী স্বাধীনতার নামে শ্রমের এই বিভাজন ভেঙে ফেললে অদূর ভবিষ্যতে দেশে বিপর্যয় নেমে আসবে, সমাজব্যবস্থার ধারা ধ্বংসমুখে পতিত হবে।

নারীর গৃহকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সন্তান লালন-পালন। সন্তান লালন-পালনে নারীপুরুষ উভয়ের বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই সন্তানের জীবন ধারণ ও তা সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা সুনিশ্চিত করে। কিন্তু মুনাফাখোর ও স্বার্থান্বেষী মহল নারীদেরকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, সন্তান পালন সম্মানজনক কর্ম নয়,

হেয় কর্ম! তাই নারীকে সম্মানিত হতে হলে গৃহ ছাড়তে হবে। গৃহের বাইরের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থোপার্জন করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ নারী স্বাধীনতার ধারণাকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত ও বিকৃত করেছে।

ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শ যারা মানতে পারেন না, তাদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে, নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও সামর্থ্য কখনই একরকম নয় এবং এই শারীরিক পার্থক্যকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে আদিম শ্রমবিভাজন। পুরুষ বাইরে আর নারী কাজ করেছে গৃহে। এই শ্রমবিভাজন সামাজিক বিকাশকে শুধু ভারসাম্যতাই দেয়নি, যুগ যুগ ধরে তা প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয় হয়ে এসেছে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে মুনাফাখোরী এবং অর্থলিপ্সার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় নারী হয়েছে সবচেয়ে সস্তা পণ্য। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা এদেরকে যেনতেন কাজে ব্যবহার করে দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে এবং যখনই অবাধ বিচরণ নামের ব্যভিচার বন্ধের দাবি উঠছে তখনই এরা নিজেদের ভবিষ্যত অন্ধকার ভাবছে। করছে অনৈতিক প্রতিবাদ।

স্বাধীনতার নামে নারীর হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে সামান্য কিছু পয়সা। এই স্বাধীনতার লক্ষ্য যদি হয় সুখী হওয়া, তবে হলফ করেই বলা যায়, এরা নারীদের সঙ্গে চরম প্রতারণা করেছে এবং সুখী করার নামে এদের সংসারকে ভরে দিয়েছে শূন্যতায়। সংসারটা মূলত নারীরাই পরিচালনা করে। সংসারমুখি সুগৃহিণী রচনা করে সাংসারিক

সুখের ভিত্তি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে 'নারীপণ্য' ব্যবহার করে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা সেই শ্বাশ্বত বুনিয়াদকে নারী স্বাধীনতার নামে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করেছে।

আর যদি নারীকে পেশার সঙ্গে যুক্ত হতেই হয়, ইসলাম সেটাকেও বারণ করে না। বরং ইসলামের ইতিহাসের বহু ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেখানে নারী সরাসরি অর্থোপার্জনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মদীনার উপকণ্ঠ থেকে উটের খাদ্য সংগ্রহ করে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতেন, অনেক নারী সরাসরি কেনাবেচা করেছেন বলেও বর্ণনায় পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে সম্পদের মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। দেখুন আল্লাহর বাণী কী বলে :

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢ ﴾ [النساء: ٣٢]

'পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩২}

নারীর নিজের উপার্জিত অর্থের মালিক সে নিজেই। তার বাবা, ভাই বা স্বামীর তাতে কোনো অধিকার নেই। তারা কেউ তার মালিকানায় বাগড়া দিতে পারবেন না। বিখ্যাত প্রতাপশালী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্ত্রী ঘরে চরকায় সূতা কাটতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা

হলে তিনি বললেন, 'অভাবের কারণে নয়, আমি পিতার নিকট থেকে আয়-রোজগারের এই শিক্ষা পেয়ে এসেছি।'

ইসলাম নারীদের বন্দি করতে চায় না। চায় তাকে নিরাপদ রাখতে। এ কারণেই ইসলাম নারীকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে আসতে নিরুৎসাহিত করে। এর অর্থ এ নয় যে সে প্রয়োজনের সময় বের হতে পারবে না। নিরাপদ পরিবেশে ইসলামের চেতনা ভূলুণ্ঠিত না করে নারীর অর্থোপার্জনে ইসলাম কোনো অন্তরায় তৈরি করে না। অথচ ইসলামের শত্রুরা অপব্যাখ্যা করে স্বার্থ হাসিলের জন্য নারীদের ক্ষেপিয়ে তোলার চক্রান্ত করছে।

মনে রেখো নারী! এরা এভাবেই সামান্য মঞ্চের মাইক, স্লোগান দেবার সুযোগ প্রদান কিংবা এরচেয়েও সস্তা মূল্যের নগণ্য কিছু বস্তু দিয়ে তোমার ইজ্জত-সম্ভ্রম কেড়ে নিতে ওঁৎ পেতে আছে। এজন্যই বলি, নারী তার নিজস্ব বলয়ের স্বাধীনতা, অধিকার, সম্মান এবং অর্থোপার্জনের অধিকার লালন করুক। কিন্তু তারা যেন কারো হাতে ব্যবহৃত না হয়। তাদের দেহ, সম্ভ্রম ও ইজ্জতকে সওদা বানিয়ে কেউ মুনাফাখোরি না করুক। ধর্ষিত, সম্ভ্রমহারা, বিবস্ত্র নারীর দেহে সম্মানের চাদর পরিয়ে দেয়া যদি অপরাধ না হয় তবে নারীর প্রতি শালীনতার আহ্বান জানানোও অপরাধ নয়।

একথা স্মরণ রাখা চাই যে, ইসলাম নারী অধিকারের যে নিখুঁত রূপরেখা প্রদান করেছে এটা বাস্তবায়ন না করা হলে নারী কখনই তার প্রাপ্ত সম্মান ও অধিকার লাভ করতে পারবে না। আজ নারীকে ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে সেটা নিশ্চিত না করে বরং তাদেরকে

শ্রমিক-গৃহপরিচারিকা এবং অন্য পুরুষের ভোগের পণ্য বানানোর জঘন্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এসব ঘৃণ্য পরিকল্পনা রুখতে না পারলে অচিরেই মানবিক বিপর্যয় নেমে আসবে, যার প্রথম ও চূড়ান্ত আঘাত আসবে খোদ নারীর ওপরেই। মনে রাখতে হবে বিশেষ এক হেকমতে মীরাছ ছাড়া অন্য সবখানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে তার প্রাপ্ত যাবতীয় হক আদায় করার আদেশ করেছেন। এমনকি তিনি নারীর অধিকার শুধু নিশ্চিতই করেন নি, বরং তাদেরকে পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন। যেমন

«سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ»

'তোমরা দান-হাদিয়ার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করো। কেননা আমি যদি কাউকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতাম তবে নারীকে প্রাধান্য দিতাম।' [সুনানে বায়হাকী : ১২৩৫৭; তাবারানী : ১১৯৯৭]

সুতরাং শরঈ গণ্ডির মধ্যে যদি অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হতো তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকেই অগ্রাধিকার দিতেন। সুতরাং নারীদের প্রতি দরদ ও অনুগ্রহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো বেশি থাকতে পারে না।

নারীদের গৃহকর্ম ও সংসার পরিচালনার আর্থিক লাভ কোনো অংশে বাইরে চাকরি করে টাকা উপার্জনের চেয়ে কম নয়। এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর গৃহিণীদের দ্বারা যে গৃহকর্ম হয় তার খরচ ২২ হাজার কোটি টাকা! সুতরাং হিসেবে যুক্ত

না হলেও গৃহিণীদের দ্বারা প্রতিবছর এই পরিমাণ টাকা আয় হচ্ছে। তো প্রগতিবাদী ও নারী স্বাধীনতার তথাকথিত দাবিদারদের কথা অনুযায়ী সব নারী যদি ঘরের বাইরে চলে আসে তবে সংসারই বা দেখবে কে আর বছরে এই বাইশ হাজার কোটি টাকার যোগানই বা দেবে কে? স্বার্থান্বেষী এই মহল কি এই পরিসংখ্যানটা মাথায় রাখে?

নারী তাদের ইজ্জত বিক্রি করে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করবে, ইসলাম তা কখনও বরদাশত করে না বরং পুরুষ নিজের রক্তকে ঘামে পরিণত করে ইজ্জতের সঙ্গে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবে এটাও আদেশ করে। যারা ইসলামের এই মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না, সব বিতর্ক বাদ দিয়ে তাদেরকে মানুষ বলে আখ্যায়িত করা যায় কিনা- সর্বাগ্রে এই বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেতে পারে!

# যে গল্প উপন্যাসের চেয়েও কাল্পনিক

মমতা ওরফে মম। তিন তিনটে উপন্যাস লিখেছেন। শব্দের মায়ায় মোহিত করেছেন শ্রোতা-পাঠকদের। বাক্যের গাঁথুনীতে গড়ে তুলেছেন নায়ক-নায়িকার কল্পনার সুরম্য প্রাসাদ। হাসি-বেদনার সংমিশ্রণে পাঠকদের অভিভূত ও বেদনাহত রাখার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের কল্পনাশক্তি ব্যয় করে পাঠকদের ঘুরিয়েছেন কল্পনার ইথারে-পাথারে। কিন্তু সামান্য একটা ভুলে তিনি এক সময় এমন গল্পের নায়িকায় পরিণত হয়েছেন- কোনো কবি, গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের কল্পনায় যে গল্পের চিত্রায়ন সম্ভব হয়নি কখনও।

কল্পলেখকদের এই এক সমস্যা। কল্পনার জাল বিছিয়ে যিনি পাঠকদেরকে অবাস্তব চত্বরে ছোটাছুটি করান তিনিই আবার পাঠকের অবাস্তব রচনায় বিভ্রান্ত হন। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গল্পের খোরাকে পরিণত হন।

আমাদের আলোচ্য ব্যক্তির নাম মমতা। সংক্ষেপে মম। বগুড়ার মেয়েটি দীনদার পরিবারের। বাবা তাকে প্রথমে আলিয়া মাদরাসায় পড়তে দিয়েছেন। সেখান থেকে কামিল (আলিয়া মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি) পাশ করার পর ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। ঢাকার মিরপুরে আত্মীয়ের বাসায় থেকে ভার্সিটির লেখাপড়া শুরু। ধার্মিক বাবা মেয়ের ধর্মপরায়ণতার ভরসায় মেয়েকে ঢাকায় ছেড়েছেন। নতুবা ঢাকার পরিবেশ নিয়ে তারও ভয় ও শঙ্কা

ছিল। মম বাবাকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন এবং কখনও বিপথগামী হবেন না বলে বাবাকে নির্ভার করেন।

প্রথম কিছুদিন বাবাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছেন তিনি। কখনও অন্য মেয়েদের মতো ফালতু কাজে জড়াতেন না। ছেলেবন্ধুর পাল্লায় পড়তেন না। মোবাইল-বন্ধুও পাত্তা দেন না। কিন্তু একপর্যায়ে এসে তার আত্মশাসনের বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়। ঢাকার তরুণ-তরুণীদের উতলা জীবন ও বাঁধভাঙা উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার মমকেও স্পর্শ করে। মামুন নামের একটা লোক মমের ওপর নজর বিছায় এবং তার খালাতো বোনের মাধ্যমে তার মোবাইল নাম্বারটা সে হস্তগত করে ফেলে। মামুন মমকে নিজের পরিচয় দিল তার ভক্ত পাঠক বলে। তার লেখা বইয়ের শব্দগুলো তার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে বলেও অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। এরপর ফোন দেয়ার মূল কারণ উল্লেখ করে কোনোরূপ রাখঢাক না করেই বলল, আমি আপনার ভক্তপাঠক। আমি জানি আপনি অনেক কঠিন মেয়ে। পাথরের চেয়েও হয়ত কঠিন। আমার জীবনে এমন মানুষই দরকার। আমি এমন মানুষই আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চাই।

অপ্রস্তুত মমের কাছে মামুনের কথাগুলো একেবারেই নতুন। আনুখা, অপরিচিত। তিনি কখনও এধরনের কথার সঙ্গে পরিচিত নন। তাই এসব কথার পিঠে কেমন কথা ছুঁড়তে হয় তাও তিনি জানেন না। তাই কোনোমতে ‘কথা রাখা সম্ভব নয়’ বলে লোকটাকে তাৎক্ষণিক নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি।

কিন্তু মামুন তাতে মোটেও দমল না। মম সফল লেখিয়ে, আর মামুনের সফলতা লোক পটানোয়। এখানে লেখকের কারিশমা পাঠকের চাণক্যে ধরাশায়ী হলো। বহুবার নিবৃত করা সত্ত্বেও মামুন মমকে নিজ জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হলো। দ্বিধায়-সংকোচে এক সময় সাড়া দিলেন শক্তমনের অধিকারী মম! যিনি বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজধানীর উষ্ণ আলিঙ্গনে নিজেকে হারিয়ে যেতে দেবেন না, রক্ষা করবেন পারিবারিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তি আভিজাত্য। প্রতিশ্রুতির মাথা খেয়ে এভাবে ভক্তপাঠকের ছদ্মাবরণের মামুনের প্রেমে জড়িয়ে পড়লেন। বাবার নির্ভারতায় বাধাহীন গতিতে এগিয়ে চলল তার মামুন-সখ্য।

মামুন মমকে শুধু বিমোহিতই করলেন না; বিভ্রান্তও করলেন। তিনি সযত্নে তার পারিবারিক অবস্থা গোপন করতে সক্ষম হলেন। সখ্যের গভীরতা সম্বন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মামুন মমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মম তাতে সায়ও দিলেন কিন্তু পারিবারিকভাবে আসার প্রস্তাব দিলেন। মামুন জানেন, এধরনের প্রস্তাব আসবে মমতার পক্ষ থেকে। তাই কথাও সাজিয়ে রেখেছিলেন সেভাবেই।  সে অনুযায়ী পারিবারিক নানান সমস্যার কথা বলে দুজন দুজনায় বিয়েকর্মটা সেরে নেয়ার পাঁয়তারা করলেন। মম এখানেও তেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেন না। মনে পড়ল না মাবাবা ও সমাজ-সংসারের কথা। মামুনের বিয়ে না করলে আত্মহত্যার হুমকিই তার কাছে সবচেয়ে বড় মনে হয়। মামুন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, তার একমাত্র প্রেম ব্যর্থ হলে প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ির চাকার নিচে

পিষ্ট হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবে সে। তবু অপবিত্র (?) হতে দেবে না তার প্রেমকে! যমের ভয়, তার কারণে যদি তার প্রিয় মানুষটি চিরতরে হারিয়ে যায়?

তাই কোনো সুযোগ নিলেন না আত্মনিয়ন্ত্রণের। স্মরণ করলেন না বাবার সঙ্গে কৃত ওয়াদার কথা। প্রিয় মানুষকে হারানোর আশঙ্কায় সব অভিভাবককে অন্ধকারে রেখে বগুড়ার এই মেয়েটি ২০১১ সালের ১৭ নভেম্বর মামুনের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শুরু হলো কানামাছি খেলা। মামুন যেন শহরের জন্মসূত্রের বাসিন্দা। গ্রামে তার কোনো বাড়ি-ঘর নেই! বাড়ির কথা বলেও না, মমতাকে বাড়িতে নেয়ার চেষ্টাও করে না। এমনকি বাড়ির কারো সঙ্গে যোগাযোগও করতে দেয় না তাকে। এভাবে অস্বস্তি বাড়ে মমতার। একপর্যায়ে তার বাড়িতেও সংবাদটা পৌঁছে। হতবাক হয়ে যান মমতার বাবা। মেয়ের এই গাদ্দারী তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।

মা বাবার আঘাত, স্বামীর সন্দেহজনক আচরণ বিচলিত করে মমতাকে। এই প্রথম মনে হতে থাকে পিতামাতার স্নেহ ও মতামতের গুরুত্ব অবজ্ঞা করা মোটেও ভালো হয়নি। নারী জীবনের ভালো পাত্র নির্বাচন যে কত জরুরী তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকেন মমতা। ইমাম গাযালী রহিমাহুল্লাহ বলেন-

والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّمَا

النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ عَتِيْقَتَهُ ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن يتخيرا طيبا أصيلاً

বিয়ের ব্যাপারে নারীদের ক্ষেত্রে একটু বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেননা বিয়ের মাধ্যমে নারী আবদ্ধ হয়ে যায়, এ থেকে (স্বামীর মৃত্যু বা তালাক ছাড়া) সহজে নিষ্কৃতির কোনো পথ খোলা থাকে না। পক্ষান্তরে পুরুষ লোক যেকোনো সময় বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার সামর্থ্য রাখে। আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, বিবাহ হচ্ছে এক ধরনের বন্দিত্বের নাম। সুতরাং লোকেরা যেন খেয়াল করে তার প্রিয় আজাদ সন্তান (কন্যাকে) কোথায় বন্দি করছে।' [সুনানে বায়হাকী : ১৩৮৬৩] একারণেই নারীর অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে উত্তম, দীনদার ও সৎ ব্যক্তিকে বর হিসেবে নির্বাচন করা।

নারীর যে জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেই জীবন সম্পর্কেই তারা সবচেয়ে বেশি উদাসীনতা, খামখেয়ালী ও আবেগপ্রবণতা দেখাচ্ছে! যে নারীজীবন সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই মুসলিম মনীষীগণ সতর্ক করে আসছেন, যে জীবন নারীজীবনের সবচেয়ে বড় মাইলফলক বলে অভিহিত করছেন সেই জীবনকে নিয়েই খেলছেন স্বয়ং নারীগণ! এই খেলার ফলাফল মোটেই নারীদের পক্ষে যাচ্ছে না। খেলতে গিয়ে নিজেরাই খেলনার পাত্রী হচ্ছেন। আমাদের আলোচ্য মমতাও সেই খেলনার নির্মমতার শিকার একজন নারী।

স্বামীর পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবে ঘরে তোলার প্রক্রিয়া না দেখে মমতা শঙ্কিত হন। তার বাড়ির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও হন ব্যর্থ। এরই মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনার সূচনা হয়। মামুনের মোবাইল থেকে কৌশলে একটা নাম্বার সংগ্রহ করেন মমতা। একদিন ভয়ে ভয়ে কল দেন সেই নাম্বারে। কল গ্রহণ করেন একজন বৃদ্ধ। মমতা আমতা আমতা করে তার সঙ্গে কথা বলেন এবং খালু সম্বোধন করেন। বৃদ্ধের সরলতা মমতাকে মুগ্ধ করে। তিনি তাকে খালু থেকে বাবা সম্বোধন করে বসেন। সম্বোধনের নৈকট্যে অভিভূত হন ওই বৃদ্ধ। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন মারে! জীবনে এই প্রথম মেয়ের কণ্ঠে বাবা ডাক শুনলাম। তিনি আরো বললেন, মা! যেহেতু তুই আমাকে বাবা ডেকেছিস তাই আমিও তোকে মেয়ে হিসেবে বরণ করে নিলাম।

এরপর থেকে বাবা-মেয়ের সম্পর্কে কথোপকথন হতে থাকে তাদের। বিষয়টি মামুনও জানত না এবং ওই বৃদ্ধও জানতেন না এই মেয়েটি কে? মমতা অনুমান করতে থাকেন এই বৃদ্ধই হবেন মামুনের বাবা। তাই শ্বশুরের পরিচয় পোক্ত করতে বাবার পরিচয়টা আরো জোরালো করতে থাকেন। সম্পর্ক গভীর থেকে গভীর হলে একবার বাবার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার আব্দার করেন মমতা। মমতার আব্দারে বর্তে যান বৃদ্ধ। তিনি কল্পনাই করতে পারেন না ঢাকার একটি মেয়ে সামান্য মেয়ের পরিচয়ের ভিত্তিতে তার বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। তাই সন্দিগ্ধ বৃদ্ধ বলেন, মা! আমাদের এই অজপাড়া গাঁয়ে তুমি বেড়াতে আসবে?

বৃদ্ধের কণ্ঠে যতটুকু না আকুতি মমতার কণ্ঠে তারচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা। তাই তিনি ততোধিক ব্যাকুলতার সঙ্গে এই নতুন বাবার বাড়িতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। একপর্যায়ে তিনি সময় করে সেই বাড়িতে যান। সেখানে যাওয়ার পথে প্রতিটি মুহূর্ত কাটে তার শঙ্কা, সংকোচ ও উত্তেজনায়। যদি সত্যিই তার শ্বশুরবাড়ি হয় এটা তবে কেমন লাগবে? দুরুদুরু বুকে তিনি নতুন বাবার বাড়িতে হাজির হন। ওই বাড়ির লোকজন মমতাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে নেয়। নতুন বাবার অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিবারের লোকদের একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় আপ্লুত হন মমতা। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পরিবারের একজন লোকের উপস্থিতি তাকে হতচকিত করে তোলে। তার এই নতুন বাবা বলেছিলেন, জীবনে কখনও মেয়ের কণ্ঠে বাবা ডাক শোনেননি অর্থাৎ তার কোনো কন্যাসন্তান নেই। তবে সন্তানসমেত এই মহিলা কে? ভাবনা তাকে অস্থির করে। তাই এধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত থাকেন তিনি।

রাতে ওই মহিলার সঙ্গে মমতার শোবার ব্যবস্থা হয়। ওই মহিলাও মমতাকে নিজের বোনের মতো আপন করে নেন। রাতে শুয়ে শুয়ে সুখ-দুঃখের গল্প জুড়ে দেন। গল্পের এক ফাঁকে বলেন, এই দাঁড়াও আমার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা সেরে নিই। এই বলে মহিলা ঢাকায় তার স্বামীর সঙ্গে কথা শুরু করে দেন। পাশের মহিলার স্বামী-কথনে মমতাও নিজ স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং মুঠোফোন বের করে মামুনের নাম্বারে কল দেন। কিন্তু যতবারই কল দেন ততবারই তার নাম্বার বন্ধ দেখতে পান। এভাবে ওই মহিলা

যতক্ষণ কথা বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। অনেকক্ষণ পর ওই মহিলা মোবাইল ছাড়লে মামুনের নাম্বারে মমতার কল ঢোকে। তাই এবার তিনি নিজ স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হন।

মমতা তার স্বামীর সঙ্গে কথা শুরু করে দেয়ার কিছুক্ষণ পর ওই মহিলা কি এক অসম্পূর্ণ কথা শেষ করার জন্য স্বামীর নাম্বারে পুনরায় কল দেন। এবার তার পালা! মমতা যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই মহিলা পান তার স্বামীর নাম্বার বন্ধ! মমতা অনেকক্ষণ কথা বলে মোবাইলটা ছাড়লে তখন কল ঢোকে এই মহিলার স্বামীর নাম্বারে। বিষয়টা বেশ অদ্ভুত হলেও তখন আর কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামান না।

গল্পে গল্পে কেটে যায় রাত। রাতের গল্পে মমতা মেজবান বাড়ির অনেক কাহিনী শোনেন। শোনেন এই মহিলার বিয়ে এবং বিবাহপূর্বক বর্তমান স্বামীর সঙ্গে প্রেমকাহিনী। মহিলা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রেম এবং তার প্রতি স্বামীর অগাধ ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেন।

সব কাহিনী গল্প আর পরিবারের সদস্যদের পরিচয় জানার পর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মমতার। তিনি যে ধারণা করেছিলেন সেটাই ঠিক। তার বানানো এই বাবা তারই শ্বশুর, মামুনের বাবা! কিন্তু রাতে যে মহিলার সঙ্গে ঘুমালেন সে কে? মামুনের বউ, যাকে সে পরম ভালোবাসা দিয়ে বিয়ে করে এনেছে! ভেতরটা ভেঙে খান খান হয়ে যেতে চায় মমতার। পরেরদিন একটু

আড়ালে গিয়ে বলে আমি অমুক জায়গায় অমুকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। কথা শুনে মাথায় বাজ পড়ে মামুনের। নিজের গোমর ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে সে। মমতাকে প্রথমে ধমকি এবং পরে অনুনয়-বিনয় করে পরিচয় প্রকাশ না করতে এবং ঢাকা আসলে সব কথা বলবে বলে মমতার পায়ে পড়তে থাকে।

মমতা দিশেহারা হয়ে যান। একবার ইচ্ছা করেন নিজের পরিচয়টা প্রকাশ করে দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই ভেসে ওঠে মামুনের বউটার কথা, রাতে যে তাকে তার স্বামীর পরম ও অকপট ভালোবাসার কথা শুনিয়েছে। এমন একজন সরল মনের মেয়েকে কষ্ট দিতে চান না মমতা। কষ্ট দিতে চান না মামুনের বাবাকে। তাই সফর সংক্ষিপ্ত করে সেদিনেই ঢাকা রওয়ানা হন। ঢাকা আসার পর মামুন তার প্রতি চরম ক্ষিপ্ত হয়। কেন তাকে না বলে সেখানে গেল- এই অপরাধে তাকে টর্চার করতে থাকে। মামুনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তার বাবার কাছে সব তথ্য ফাঁস করে দেন মমতা। মমতার কথায় গোটা পরিবার মাথায় হাত দিয়ে বসে। বেশি আঘাত পান মামুনের পূর্বের বউ। মমতার কাছে ছোটো হয়ে যায় সে। বুকটা কত উঁচু করেই না মমতার কাছে স্বামীর গুণকীর্তন করেছিল সে। কিন্তু স্বামী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে কিনা সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু মমতার সঙ্গে যে প্রতারণা করেছে তা নির্ঘাত সত্য।

কেননা ঘরে বউ-বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও অবিবাহিত বলে বিয়ে করেছে মমতাকে। তাই মমতার জন্য করুণা হয় তার। মামুনের বাবাও মমতাকে খুব স্নেহ করেছিলেন। এখন তাকে কোন মর্যাদায় ভূষিত

করবেন তা ভেবে গলদঘর্ম হন। কারণ, মামুনের প্রথম বউকেও তিনি অনেক স্নেহ করেন। মেয়েটা অনেক ভালো। সংসারের সবাইকে সে আপন করে নিয়েছে অতি আন্তরিকতায়। তাই তার সমপর্যায়েও কাউকে রাখতে মনে সায় দেয় না তার। তাই মমতাকে অবাস্তব এক প্রস্তাব দিয়ে বসেন তিনি। তাকে তার মেয়ে হিসেবেই রেখে দিতে চান এই সংসারে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব মমতার জীবনে? স্বামীর সংসারে কেউ কি ‘রিজার্ভ সদস্য’ হয়ে থাকতে চায়?

মমতার উপলব্ধিতে আজ বাস্তবতা ফিরে এসেছে। তিনি ভাবেন, স্বরচিত উপন্যাসের কল্পিত গল্পের চেয়েও মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক ও অবিশ্বাস্য তার বাস্তব ও ঘটমানজীবন!

## সুস্থ ও অসুস্থ বিনোদন এবং খেলাধূলার বিশ্বায়ন

মানবসত্তার স্বাভাবিক গতি ও ধারা বহমান রাখতে মানসিক প্রশান্তি ও চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শরীয়ত তা অস্বীকার তো করেই না, বরং উৎসাহ প্রদান করে। ইসলাম বৈধ চিত্তবিনোদনের শুধু বৈধতাই দেয় না; বরং তাগিদও দেয়। আর এই প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যমে প্রশান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ মানসিকতার উদ্ভব ঘটে। মানুষের জীবনে ব্যাপক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং এর কারণে জীবনযাত্রা সুন্দর ও সাবলীল হয়। কারণ, বৈধ বিনোদন, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-কৌতুক ইত্যাদি আচরণ দ্বারা মানুষের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ইবাদতে চাঙ্গাভাব সৃষ্টি হয়। কেননা মানুষের অন্তর ক্লান্ত ও পলায়নপর।

সুতরাং সে যদি সর্বদা নফসকে তার স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে রাখে তবে তা ক্লান্তিকর হয়ে যাবে এবং অন্তর দ্বারা কাজ আদায় করে নেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো সময় যদি বৈধ বিনোদন করা হয় তবে তা শক্তিশালী হয় এবং জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কাজ আদায় করে নেয়ার যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

আর একথা চিরসত্য যে, বৈধ উপায়ে বিনোদনের মাধ্যমে মানুষের প্রাণ জীবন্ত হয়ে ওঠে। কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয়। ক্লান্তি-গ্লানী বিদূরিত হয়। আর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া জৈবিক চাহিদা পূরণ। জৈবিক চাহিদা পূরণে আত্মার বিনোদন হাসিল হয় এবং কর্মক্লান্তি দূর হয়।

বৈধ বিবাহে মনো-দৈহিক প্রশান্তি হাসিল হয়। বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনেও তুলে ধরেছেন। ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم: ٢١]

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত : ২১}

ইসলামে কেউ ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে থেকে স্ত্রীকে ভুলে থাকবে, স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা দেখাবে এমন অবকাশ রাখা হয়নি। সাহাবীজীবনের চমৎকার একটি ঘটনায় দেখুন কী শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ، فَقُلْنَ: مَا لَكِ، مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ، قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ»؟، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟، قَالَ: «أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صَلِّ وَنَمْ،

وَصُمْ وَأَفْطِرْ»، قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ، فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ، قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسُ».

‘উসমান ইবন মাযঊন (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)র স্ত্রী মলিন বদন এবং পুরাতন কাপড়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? কুরাইশদের মাঝে তোমার স্বামী থেকে ধনী কেউ নেই। তিনি বললেন, তার কাছে কি আমার কিছু পাওয়ার আছে? তার তো দিন কাটে সিয়ামে আর রাত কাটে কিয়ামে (সালাতে)। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। তখন তাঁরা তাঁর কাছে বিষয়টি আলোচনা করলেন। অতপর উসমান ইবন মাযঊনের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে বললেন, “আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোনো আদর্শ নেই?” উসমান ইবন মাযঊন বললেন, কী বলেন? আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন! রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি কি রাতে কিয়ামে আর দিনে সিয়ামে লিপ্ত থাকো না? অথচ তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে, আর তোমার ওপর তোমার শরীরেও হক রয়েছে। তুমি (রাতে) সালাত আদায় করবে, আবার ঘুমাবে। তেমনি (দিনে) সাওম পালন করবে আবার ভাঙ্গবেও।” বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেকদিন তার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুবাসিত অবস্থায় এলেন যেন নববধূ। রমণীকুল বললেন, বাহ। ওই মহিলা বললেন, আমাকেও তাই পেয়েছে যা মানুষকে পায়। (অর্থাৎ স্বামী সঙ্গসুখ) [সহীহ ইবনে হিব্বান : ৩১৬]

আরেকটি চমকপ্রদ শিক্ষণীয় ঘটনায়ও এ শিক্ষা পাওয়া যায়। আবূ জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ»

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবূ দারদা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সালমান আবূ দারদার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন আর উম্মে দারদা (আবূ দারদার স্ত্রী)কে ময়লা কাপড় পরা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমার অবস্থা কী?! তিনি বললেন, ‘আপনার ভাই আবূ দারদার দুনিয়ার চাহিদা নেই।’ এর মধ্যে আবূ দারদা এলেন এবং তাঁর (সালমানের) জন্য খাবার তৈরি করলেন। বললেন, ‘তুমি খেয়ে নাও, আমি সিয়াম পালন করছি।’ সালমান বললেন, ‘তুমি না খেলে আমি খাচ্ছি না।’ বাধ্য হয়েই তাকে খেতে হলো।

যখন রাত হলো, আবূ দারদা (রাতের সালাতের জন্য) উঠে পড়লেন। সালমান বললেন, ‘ঘুমাও’। তিনি ঘুমালেন। পুনরায় আবূ দারদা

উঠলে সালমান আবার বললেন, 'ঘুমাও'। রাতের শেষ দিকে সালমান তাকে বললেন, 'এখন ওঠো (সালাত আদায় করো)'। অতপর তাঁরা উভয়ে সালাত আদায় করলেন। অতপর সালমান আবূ দারদাকে বললেন, 'তোমার ওপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার আত্মার হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে, কাজেই প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক প্রদান করা উচিত।' পরে আবূ দারদা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং একথা তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সালমান সত্য বলেছে।' [বুখারী : ১৯৬৮]

সুস্থ চিত্তবিনোদনে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মক্লান্তি দূর করার বিষয়টি পুণ্যবান পূর্বসুরীদের বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত। মানসিক প্রশান্তির জন্য সুস্থ বিনোদনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

«رَوِّحُوا الْقُلُوبَ فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ عَمِيَتْ»

'তোমরা অন্তরকে প্রশান্তি দাও। কেননা, একাধারে তাকে অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করা হলে তা অন্ধ হয়ে যাবে।'

রবিআতুর রায় রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

المروءة ست خصال : ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر ، ففي الحضر تلاوة القرآن وعمارة مساجد الله واتخاذ القرى في الله ، والتي في السفر ، فبذل الزاد ، وحسن الخلق ، وكثرة المزاح في غير معصيةٍ.

‘মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে ছয়টি কাজে। মুকিম থাকা অবস্থায় তিন কাজে এবং সফরে থাকা অবস্থায় তিন কাজে। মুকিম অবস্থার তিন কাজ হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ এবং আল্লাহ তা‘আলার ওয়াস্তে মেহমানদারী করা। আর সফরের তিন কাজ হচ্ছে, পাথেয় খরচ, উত্তম ব্যবহার এবং পাপ না হলে অধিকহারে হাসি-মসকরা করা।’

তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, মানুষ যেহেতু সফরে সচরাচর স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত থাকে তাই ওই সময় তার স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য হাসি-মজাক করবে। পক্ষান্তরে গৃহে অবস্থানকালে যেহেতু স্ত্রীসঙ্গ পায় এবং মন একারণে প্রশান্ত থাকে তাই সফরে সাধারণ হাসি-ঠাট্টা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বিখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিস ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ খুবই হাসিখুশি লোক ছিলেন। তিনি এই পরিমাণ হাসতেন যে, হাসতে হাসতে তাঁর লালা গড়িয়ে পড়ত! বর্ণিত আছে-

كان ابن سيرين كثير الضحك بالنهار كثير البكاء بالليل. قال غالب القطان : أتيتُ ابن سيرين يوماً ، فسألت عن هشام ، فقال : توفي البارحة أما شعرت ،فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فضحك ، فقلت : لعله أراد النوم .

‘ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ দিনে অধিক হাসিখুশি লোক ছিলেন। আর রাতে ছিলেন অত্যধিক ক্রন্দনকারী। গালেব আলকাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি একবার ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহুর কাছে আগমন করলাম এবং হিশাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি

বললেন, তুমি জানো না, গতরাতে তিনি মারা গেছেন! তাঁর কথা শুনে আমি إنا لله وإنا إليه راجعون বললাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! তিনি আমার জবাব শুনে হেসে উঠলেন। তখন আমার বোঝার বাকি থাকল না যে, তিনি এ কথা বলে 'হিশাম রাতে ঘুমিয়েছেন' এ কথাটি বুঝিয়েছেন! কেননা, ঘুমকেও মৃত্যুর ভাই বলা হয়। [বাগবী, শারহুস সুন্নাহ : ১৩/১৮৩]

মোটকথা, ইসলাম মানুষকে তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম চালু রাখতে বৈধ বিনোদনের অবকাশ দিয়েছে এবং সময় বিশেষে তাগিদও দিয়েছে। তাই একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম কেবলই ইবাদত-বন্দেগী তলব করার ধর্ম, এখানে মানবিক চাহিদা, প্রকৃতিগত বাসনার কোনো মূল্য নেই। তবে হ্যাঁ, ইসলাম মানবিক চাহিদার সবগুলো বস্তুকে বৈধপন্থায় অর্জনের পক্ষপাতী।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আশা করি কারো এব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচ থাকার কথা নয়। অবশ্য ইসলাম মানুষকে বাঁধনহারা হওয়ার অনুমতি দেয় না। বৈধ চিত্তবিনোদন করতে গিয়ে নামাজ-কালাম ঠিক রেখে, সতর রক্ষা ও শরীয়তের অন্যান্য যাবতীয় বিধান পালন করে কেউ যদি কিছু খেলাধূলায় লিপ্ত হয় তবে শরীয়ত তাকে সেটার অবকাশ দেবে। কিন্তু তাই বলে বিনোদনের উপকরণকে ইসলাম বিশ্বয়ানের রূপ দেয়ার অবকাশ দেয়নি।

খেলাধূলাকে বিশ্বায়নের রূপ দেয়ার ক্ষতি যে কত ভয়াবহ তা সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন। তারা দেখেছেন, বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় যুব ও তরুণ সম্প্রদায়ই নয়, পৌঢ়-বৃদ্ধরাও খেলাজ্বরে

আক্রান্ত হয়, দেশের মানচিত্রে বিদেশী পতাকা টাঙানোর নির্লজ্জ বেহায়াপনা শুরু হয়। মোবাইল কোম্পানিগুলো বিভিন্ন অপশন ও সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলে, কখনও দুয়েকটা ফ্রি টিকিট দেয়ার কথা বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা বাগিয়ে নেয়। খেলা চলার সময় টিভির সামনে গেড়ে বসে গোটা জাতি। সাংসারিক, ব্যক্তিগত ও দীনী কাজ সব থমকে যায়। নামাজি ব্যক্তিকেই নামাজ কাজা কিংবা জামাত তরক করতে দেখা যায়। কিন্তু এসব ক্ষতি মাড়িয়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ক্ষতি খেলাধূলার বিশ্বায়নের কারণে সৃষ্টি হয়, তা হলো নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলিম দেশগুলো। কারণ, বিদেশী ও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বহু আগেই ব্যভিচারের বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামী মনীষীগণ চেষ্টা করছেন তাদের মা-বোনদেরকে এই জঘন্য পাপবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে ও দূরে রাখতে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের সেই চেষ্টা ও প্রাণপণ মেহনত ব্যাহত হচ্ছে। খেলাধূলার বিশ্বায়নের কারণে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ব্যভিচারের খড়কুটো ভেসে আসছে, যা প্রতিহত করা সাধারণত ব্যক্তি উদ্যোগে আদৌ সম্ভব নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বাংলাদেশের বিপিএলের বিদেশী খেলোয়াড়দের সঙ্গে কতিপয় টিভি মডেলের শারীরিক সম্পর্কের পরিকল্পিত ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

খবরে প্রকাশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলংকার দু'জন নিগ্রো খেলোয়াড়ের সঙ্গে এদেশের কয়েকজন টিভি মডেল ও টিভি উপস্থাপিকা (নাম প্রকাশ করা হলো না) অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হন।

ঘটনার বিবরণ ও বর্ণনা খুবই বেদনায়দায়ক। একজন মুসলিমের তার জন্য দেশের নাগরিকদের এভাবে বিদেশীদের হাতে ইজ্জত লুণ্ঠনের ঘটনা মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু খেলাধূলোকে বাঁচাতে হলে ইজ্জত এভাবে একটু বিলিয়ে দিতে হবেই- বলে মনে করেন এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা! তাদের ভাষ্য মতে, ঠিক মতো নারী সরবরাহ না করা হলে বিদেশী খেলোয়াড়রা খেলতে আসতে চায় না, আসর জমে না! সুতরাং খেলাধূলার এই বিশ্বায়নের যুগে খেলাধূলা বাঁচাতে হলে প্রয়োজনে লক্ষ নারীর ইজ্জত-সতীত্ব মারতেও কোনো আপত্তি নেই!

বস্তুতঃ খেলাধূলার বিশ্বায়নে মুসলমানের যে ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে তা হলো নারীদের ইজ্জত-আব্রুর ক্ষতি। বাংলাদেশের সম্মানীত নারীদের ইজ্জত-আব্রু আরো অনেকভাবেই বিদেশীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকেরাই বলতে গেলে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই নারীদের এই সম্মানে আঘাত হানছেন। অকুতোভয় বীর সাংবাদিক জনাব মাহমুদুর রহমান সাহেব তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে যেসব বিদেশীকে কূটনীতিকের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তারা কাজে যোগ দেয়ার আগেও কাঁদে, বিদায় নেয়ার সময়ও কাঁদে। একটি অনুন্নত, সুযোগ-সুবিধাহীন দেশ মনে করে কাজে যোগ দেয়ার আগে ক্রন্দন করে আর কাজে যোগ দেয়ার পর এদেশের নারীসুখে অভ্যস্থ হয়ে ওঠায় বিদায় নেয়ার সময় চরম 'বঞ্চনা'র দুঃখে ক্রন্দন করে।'

প্রতিটি দেশের কূটনীতিকরা বিশেষ নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করে থাকে। সেই নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে যেনতেন লোকের তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং যে কেউ তাদের কাছে পৌঁছতে হলে ঊর্ধ্বতন লোকদের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং এদেশের নারীদের ইজ্জত-আব্রু বিনষ্ট করার দায় কেবলই ওই নারীদের, না যারা তাদেরকে সেখানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেয় তাদেরও? এভাবে দেশের ইজ্জত নষ্ট করা কি দেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার মতো অপরাধ নয়? দেশের স্বাধীনতা নাগরিকদের ইজ্জতের জন্যই, সেই ইজ্জতই যদি রক্ষিত না হয়, তবে সেদেশের স্বাধীনতার মাহাত্ম্য থাকলো কোথায়?

সারকথা, মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করবে- এটি ইসলাম অনুমোদন করে না। তার কোনো আচরণ সমাজের শালীনতা চর্চা ও শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করবে- এটাও ইসলামে সমর্থিত নয়। মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথা ও কাজ হবে আল্লাহর নির্দেশনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল আদর্শ অনুযায়ী। যে ধরনের বিনোদন মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে এবং সীমা লঙ্ঘনের মাধ্যমে মানুষকে বেপরোয়া জীবনযাপনে ধাবিত করে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় ইসলাম। যারা বিরত হবে না তাদের জন্য শাস্তির কথা বলে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦ ﴾ [القمان: ٦]

‘একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।‘ {সূরা লোকমান, আয়াত : ৬}

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ١٩ ﴾ [النور: ١٩]

‘নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত : ১৯}

## চলছে এক রশিতে মৃত্যু-উৎসব

ঘটনার পরে ঘটনা আসে এবং এক ঘটনার প্রেক্ষিত আরেক ঘটনার গুরুত্ব ও চাঞ্চল্য কমিয়ে দেয়। নারী যেদিন থেকে তার মর্যাদার ঘর ছেড়েছে, অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে সেদিন থেকে তার দুর্ভোগের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। এভাবে কখনও তার আত্মার মৃত্যু হচ্ছে, কখনও স্বামীর ঘর আস্ত জিন্দানখানায় পরিণত হয়েছে, আর কখনও বা রশির ফাঁসে মৃত্যু হচ্ছে। কোনো কোনো মৃত্যু হচ্ছে কলঙ্কময় আর কোনো কোনোটা চরম বিব্রতকর ও বেদনাদায়ক। কোনো কোনো মৃত্যু গোটা দেশের মানুষকে ভাবিত করে তুলছে। নিজের মৃত্যুর দায় চুকাতে হচ্ছে পরিবারের লোকদের। এক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত হচ্ছে শত বিড়ম্বনা, বেদনা ও শোকাবহ হতাশা। কোনো কোনো ঘটনা পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয় হয়ে উঠছে। সেই সূত্রে পাপ হচ্ছে নিজের এবং তাদেরও, যারা পাপের পথ দেখিয়ে গেছে।

বেশ কয়েকবছর আগে খুলনা অঞ্চলে প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল এক রশিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল। সে সময় এই ঘটনা গোটা বাংলাদেশের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। ওই তো বলেছিলাম, এক ঘটনার প্রেক্ষিত আগের ঘটনার তীব্রতা ও ভীবৎসতা মুছে দেয়। সে কারণে আজকালের নানা ঘটনা খুলনার এই প্রেমিক-প্রেমিকাযুগলের স্মৃতি বিস্মৃতি করে দিচ্ছে। কারণ প্রেমিকযুগলের এক রশিতে মৃত্যু যেন এখন উৎসব ও প্রতিবাদের একমাত্র দাওয়াইতে পরিণত

হয়েছে। কয়েকটি ঘটনা তো খুব কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়েছে। যেমন-

**ঘটনা- ১ : অভিভাবকদের জব্দ করতে মৃত্যু মৃত্যু খেলা!**

ছাতকের এক প্রেমিকযুগল একরশিতে আত্মহত্যা করেছে। কিছুদিন আগে ভোরের নির্জনতায় উপজেলার চরমহল্লা ইউনিয়নের টেটিয়ারচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একরশিতে প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যার ঘটনা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। জানা যায়, গ্রামের আবদুস ছাত্তারের পুত্র আবদুল্লাহ (২৫) ও আফরুজ আলীর কন্যা কুলছুমা বেগম (১৯) সম্পর্কে তালতো ভাই-বোন। এ সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের প্রেমের সম্পর্কটি উভয় পরিবার মেনে না নিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে আবদুল্লাহর সঙ্গে কালিয়ারচর গ্রামের তার চাচাতো বোনের ও কুলছুমাকে ছাতক সদর ইউনিয়নের কাজিহাটা গ্রামে বিয়ে দেয়া হয়।

বিয়ে হলেও কুলছুমা-আব্দুল্লাহর প্রেমে নাকি এতটুকু ভাটা পড়েনি কিংবা তারা পরের ঘরে গিয়েও এবং পরের মেয়েকে ঘরে এনেও ভাটা পড়তে দেয়নি। বরং নতুন সংসারে, নতুন ভাটায় বৈধ ও পবিত্র জোয়ার আনার পরিবর্তে চালিয়ে গেছে পুরোনো ভাটায় জোয়ার আনার দাঁড়! ফলে যে কোনো উপায়ে চেষ্টা করেছে মা-বাবার স্থাপিত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের হাতে সম্পর্ক রচনার কসরত। এরই ধারাবাহিকতায় রমজান মাসে কুলছুমাকে পিত্রালয়ে নিয়ে আসা হলে প্রেমিক-প্রেমিকার যোগাযোগ আগের চেয়ে তীব্র হতে থাকে।

উভয় পরিবারের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে কুলছুমা-আবদুল্লাহ রচিত করে নতুন এক প্রেম কাহিনী। ঘটনার দিন সকালে ছাতক-জাউয়া সড়কের আজাদ মিয়ার পুকুর পাড়ের একটি রেইন ট্রি গাছে এক রশিতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে প্রেমিকযুগল। ভোরে ঝুলন্ত লাশ দেখে পথচারীরা পুলিশে খবর দেয়। কান্নায় ভাসে দুটি পরিবার আর লজ্জায় ভাসে গোটা দেশ। নিমজ্জিত হয় সভ্যতা ও আমাদের মুসলিম তাহজিব-তামাদ্দুনবোধ!

**ঘটনা- ২ : শেষ ঠিকানাও যেন হয় পাশাপাশি!**

এ এক অন্যরকম প্রেম। একে অপরকে ভালোবেসেছেন ভীষণভাবে। এ ভালোবাসার স্বীকৃতি জীবনে পাবেন না বলে প্রেমিক-প্রেমিকা বেছে নিয়েছেন মৃত্যুর পথ। তাও আবার একসঙ্গেই। মৃত্যুর পরও তাদেরকে যেনো আলাদা করা না হয়, সে বার্তাও জানিয়ে গেছেন চিঠিতে!

ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রাম রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নে হাজী মকবুল আহমদ সওদাগরের বাড়িতে। ঘটনার দিন রাত ২টার দিকে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছেন প্রেমিক রমজান আলী (২০) আর প্রেমিকা সুখী (১৬)। বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে আমগাছের ডালে শাড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন এ যুগল।

জানা যায়, আত্মহত্যার সময় দুজনের কোমর বাঁধা ছিল কাপড় দিয়ে। সেখান থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

উদ্ধার করা চিরকুটে লেখা ছিল, ‘এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সবার কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদের দেহগুলো দয়া করে কাটতে দেবেন না। পাশাপাশিই আমাদের কবর দেবেন। সবাই আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আমরা একজন আরেকজনকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, তাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম। বেঁচে থাকতে তো আর কেউ আমাদের এই সর্ম্পক মেনে নেবে না। তাই এই পথ বেছে নিলাম।’

জানা গেছে, ‘রমজান আর সুখী সম্পর্কে বেয়াই-বেয়াইন ছিলেন। রমজান স্থানীয় নোয়াপাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আর সুখী নোয়াপাড়া মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দা তারা। রমজানের বাবা সৌদী প্রবাসী আর সুখীর বাবা সিকিউরিটি গার্ড।

কয়েক বছর আগে রমজানের বড়ভাই আজগর প্রেম করে সুখীর বড়বোন লাকিকে পালিয়ে বিয়ে করেন। সুখীর পরিবার বিষয়টি মেনে নেয়নি। দুই পরিবারের সঙ্গে এখনও সর্ম্পক বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এরই মাঝে আছগরের ছোটভাই রমজানের সঙ্গে লাকি আকতারের ছোট বোন সুখীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। বড়ভাই বোনের বিয়েকে দুই পরিবার মেনে নেয়নি বলে তাদের এ সম্পর্কও মেনে না নেয়ার ধারণা থেকে এই যুগল আত্মহত্যা করেছে বলে অনুমান করা হয়।

ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মর্মান্তিকতার এই আখ্যান শেষ হবে কবে? শুধু চোখের পানি আর হাপিত্যেশ করেই কি অধপতন ঠেকানো যায়?

লক্ষ্য করে দেখবেন, উভয় ঘটনার সূত্র এক। তালতো ভাইবোন আর বেয়াই-বেয়াইনের প্রেমাখ্যান। হাদীসে কতভাবে যে এধরনের সম্পর্ক স্থাপনে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বৈবাহিক সম্পর্কের এই আত্মীয়-স্বজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাৎ মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'উকবা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»

'পরনারীর কাছে প্রবেশ থেকে সাবধান থেকো। এক আনসারী সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল দেবর-ভাসুরের বিষয় কিভাবে দেখেন? তিনি বললেন, দেবর-ভাসুর তো সাক্ষাৎ মৃত্যু।' [বুখারী : ৫২৩২]

কারণ চাচাতো, খালাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে যে জবাবদিহিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার দায়বদ্ধতা আছে সেটা বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে স্থাপিত সম্পর্কে নেই। এমনিভাবে অনাত্মীয় নারীপুরুষে সংকোচ, পরিচয়হীনতার কারণে যে জড়তার সুযোগ থাকে সেটাও আত্মীয়তার সূত্রে স্থাপিত সম্পর্কে অনুপস্থিত। ফলে এই দুই সম্পর্কের মাঝামাঝি আত্মীয়তার সূত্রে স্থাপিত হয় এমন এক ভয়ানক সম্পর্ক, যেখানে না আছে জড়তা-সংকোচ, না আছে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। ফলে এই সম্পর্কের লোকেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে

ঘটায় এমন অবস্থা, যা কোনো কোনো সময় বাস্তব মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়।

হাদীসে একারণেই এধরনের সম্পর্ককে মৃত্যুকূপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসবিশারদগণ এই হাদীসের অনেক রকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ তাবিল ও ব্যাখ্যার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে হাদীসের শাব্দিক অর্থ পরিহার করে এর অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, 'মৃত্যু যেমন ভয়ানক এই ধরনের সম্পর্কের পরনারী পুরুষও একে অপরের জন্য ভয়ানক। হাদীসে প্রকৃত মৃত্যু বোঝানো হয়নি।' কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ব্যক্তির দীনের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে।

অন্যদিকে কোনো কোনো হাদীসবিশারদ কোনোরকম তাবিলের আশ্রয় না নিয়ে সোজাসুজি এর শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, 'বস্তুত বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত সম্পর্কের ভিত্তিতে অবাধ মেলামেশার কারণে অনেক সময় তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' যেমন ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

خرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت، والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت. وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة

'বাক্যটি আরবরীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়, যুদ্ধ মৃত্যুর আরেক নাম তথা যুদ্ধই মৃত্যু, বাঘই মৃত্যু। অর্থাৎ যুদ্ধের মুখোমুখি হলে যেমন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়, তেমনিভাবে গায়রে মাহরাম নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশায় মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হয়।

যেমন, অবাধ মেলামেশার কারণে স্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হয়ে স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদান এবং তালাকের কারণে আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগায় স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা ব্যভিচার সংঘটিত হলে রজমের শাস্তিজনিত কারণে মৃত্যুবরণ।'

সত্যি এই হাদীসবিশারদগণ এই যুগের বাস্তবচিত্র তাদের দূরদর্শিতার আয়নায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই আজ থেকে বহুবছর আগে তাঁরা যখন এই তাফসীর করেছেন তখন অনেকেই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করলেও আজ সেই অর্থই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে!

এভাবে অবাধ মেলামেশার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কাকে সুদূরপরাহত ভাবার কোনো কারণ নেই। অতীত ইতিহাসে এধরনের অনেক ঘটনার নজির পাওয়া যায়। মুনাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ এক স্থানে উল্লেখ করেছেন- 'বনী ইসরাঈলের জনৈক পাদ্রীর কাছে একবার এক যুবতী মেয়েকে আনা হলো এক রোগের চিকিৎসা করার জন্য। তিনি প্রথম অবস্থায় যুবতীর চিকিৎসা করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তারা এতে পীড়াপীড়ি শুরু করে, যারফলে বাধ্য হয়ে ওই পাদ্রী তাকে নিজের কাছে রেখে দেন। পাদ্রীর সঙ্গে যুবতীর অবাধ মেলামেশার একপর্যায়ে শয়তান এসে তাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং পাদ্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত করায়। এতে যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। শয়তান এবার নতুন ফাঁদ পাতে পাদ্রীর কাছে এসে কুমন্ত্রণা দেয়, এই ঘটনা প্রকাশ পেলে লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। তাই যুবতীকে হত্যা করে ফেলো। কুমন্ত্রণা অনুযায়ী পাদ্রী তাকে হত্যা করে। এরপর শয়তান যুবতীর পরিবারে যায় এবং

তাদেরকে পাদ্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে তারা তাকে বন্দি করে এবং হুমকি-ধমকি দেয়া শুরু করে। শয়তান আবার আসে পাদ্রীর কাছে। তাকে বলে, আমাকে সিজদা করো, তোমার মুক্তির ব্যবস্থা হবে। দিশেহারা পাদ্রী জীবন বাঁচানোর জন্য শয়তানকে সিজদা করে।'

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কত ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই যদি আজই সতর্ক না হই তবে অহরহ ঘটতে থাকবে একরশিতে নারীপুরুষের ঝুলে পড়ার এই মৃত্যুখেলা। অভিভাবকরা আর কতদিন এভাবে সন্তানের মৃত্যুখেলার অসহায় দর্শক হয়ে অশ্রুপাত করবে?

## নারী বধের মিছিল

এক রুশ কূটনীতিক বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের কী দেখে মুসলিম হলেন এবং কীসে আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করলো এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্ময়কর একটা তথ্য দিলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি ও অনিয়ম! তার জবাবে হতবাক সবাই। অনিয়ম-দুর্নীতি দেখে কেউ মুসলিম হয়? প্রশ্নকারীর বিস্ময় দেখে বিষয়টা খুলে বললেন এই নবমুসলিম। তিনি বললেন,

বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে অনিয়ম, দুর্নীতি, ঘুষ-উৎকোচ এবং উপরি কামাই ছাড়া কোনো কাজ হয় না। একজন পিয়নও উৎকোচের নিশ্চয়তা ছাড়া চিঠি পৌঁছায় না। ক্ষমতার দাপটে থাকা লোকেরা সাধারণ গ্রাম্য বিচার করেও ঘুষ খায়। এত অনিয়ম-দুর্নীতির পরও দেশটি টিকে আছে, দেশের মানুষ বেঁচে আছে! তাই আমি ভাবিত হই, কী করে একটা দেশের মানুষ এত অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকে? আমার ভাবনায় আসে নিশ্চয় এর পেছনে এমন কোনো শক্তি আছে, যা তাদেরকে এই অন্ধকারের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে, দেশটিকে টিকিয়ে রেখেছে। আর সেই শক্তি হচ্ছে ইসলাম। তাই আমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।'

এই হচ্ছে একজন বিদেশীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র। মাঝেমধ্যে ভাবি, বাংলাদেশের দুর্নীতিরও একটা কীর্তি আছে- বিধর্মীদেরকে আলোর দিশা দিতে পারে! অন্ধকার আছে বলেই তো আলো! অন্ধকার বলেই তো আলোর মাহাত্ম্য! একারণেই বিচক্ষণ লোকেরা অন্ধকার থেকে আলোর দিশা নেয়, অন্ধকারের অপর পিঠে আলো খুঁজে বেড়ায়। যেমন খুঁজেছিলেন এবং পেয়েছিলেন এই রুশ নাগরিক।

কিন্তু সবাই আঁধারে আলো খোঁজে? অন্ধকারে পায় আলোর দিশা? না, অনেকে বরং অন্ধকার থেকেই অন্ধকারের পথে যাত্রা করে। এক পাপ থেকে রচনা করে আরেক পাপ এবং বৃহৎ পাপ। সেই পাপের পথের এক পথিকের যাত্রা কত মানুষের জীবনকে যে তছনছ করে দেয় তার হিসেব করা ভার। এই পথের যাত্রা শুধু একজন মানুষের

জীবনকে ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ করে না, গোটা সমাজকে ঠেলে দেয় ভয়াবহ পরিণতির দিকে। এমনি একটি ঘটনার জনক আবিদ (ছদ্মনাম)। মানুষ বললে ভুল হবে- সম্ভ্রমখেকো জলজ্যান্ত এক নরপশু। পশুরাও একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা মানুষরাই তা পারি না। চেষ্টা করি মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভেদ করে পশু-নরকীট সব কিছুর সংজ্ঞা ছাড়িয়ে যেতে। যেমন করেছে আবিদ। পাশের বাড়ির একটা মেয়ে তাকে পছন্দ করত। চেষ্টা ছিল তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে। মেয়েটির পরিবারও বিষয়টি চাইত। সহজ পথে কাজ হবে না ভেবে মেয়েটা এক অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। একদিন আবিদের ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে পড়ে অপবাদের বাষ্প ছড়াতে থাকে। ঘটনার বায়ু এলাকা গরম করে তুললে বিচার সাজানো হয়। চেষ্টা করা হয় মেয়েটিকে আবিদের সঙ্গে বিয়ে দিতে। কিন্তু আবিদের বাবা কোনোমতেই তা মানতে চান না। শেষ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করে আবিদকে মুক্তি দেয়া হয়।

সন্দেহ নেই, এক্ষেত্রে আবিদ মজলুম, অন্যায়ের শিকার। বাংলাদেশে এধরনের জুলুমের শিকার হন অনেকেই। কিন্তু এই জুলুম থেকে আবিদ পাপের যে দরজা উন্মুক্ত করে তা মানবতার আকাশে বিরাট দাগ ও কালি বলেই জ্ঞান করতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা করে, নারী জাতির ওপর দিয়ে সে এই জুলুমের ঝাল মেটাবে। একটা নারীর বদলে শত শত নারীকে নষ্ট করবে। ইজ্জত-আব্রু ধ্বংস করবে। কী জঘন্য মনোবৃত্তি, নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা। ‘নিজের পাপের শাস্তি নিজেই ভোগ

করতে হবে এবং একজনের পাপ অন্যজন বহন করবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ١٦٤ ﴾ [الانعام: ١٦٤]

‘আর প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই ওপর বর্তায়। আর কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৬৪}

তাহলে এক মেয়ের অপরাধের কারণে কেন হাজার নারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা? কেন একজনের বোঝা অপরজনের ওপর চাপানো? নিষ্ঠুর এই মনোবৃত্তি কত ভয়ংকর হতে পারে তার সবচেয়ে দৃষ্টান্ত সম্ভবত আবিদ। প্রতিশোধের এই জিঘাংসা নিয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে রংপুরের এক কলেজে ভর্তি হয় সে। পড়াশোনার চেয়ে জিঘাংসা বাস্তবায়ন করা তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। প্রথমে টার্গেট করে রংপুরের মিঠাপুকুরের মেয়ে নীলিমাকে (ছদ্মনাম)। উত্তরাঞ্চলের মেয়েরা সরলতার অভিধায় প্রসিদ্ধ। নীলিমাও তার বাইরে নন। অবশ্য প্রথম প্রথম নীলিমা অপরিচিত লোকটার কথার ফাঁদে পা দিতে সংকোচ করেন। কিন্তু এক বিধ্বংসী জিঘাংসা নিয়ে কলেজে এসেছিল আবিদ। তাই তার এই জিঘাংসা পূরণ করতে ফাঁদের পর ফাঁদ পাততে থাকে। বিছাতে থাকে জালের পর জাল। যে জাল ছিন্ন করা নারীদের জন্য বিশেষত উত্তরাঞ্চলের

সরল মেয়েদের জন্য দুরূহই বটে। তাই আবিদের মুখে বোন সম্বোধন শুনে মোমের মতো গলে যান নীলিমা। কথিত ভাইকে নেন আপন করে। আপনত্বের ঘড়ির কাঁটা স্বস্থানে দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি, ক্যালেণ্ডারের পাতায় যোগ হয়নি নতুন আরেকটি দিন, কিন্তু এই নতুন ভাইবোনের জীবন-দিগন্তে যেন উদিত হয়েছে আপনত্বের অনেকগুলো সূর্যিমামা, যেন অকৃত্রিমতার ক্যালেণ্ডারে যোগ হয়েছে অনেকগুলো দিন। তাই ছোটো ভাই বড় বোনকে ফোন দিয়ে জানায়, সে তাকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে যাবে!

নীলিমা নিজেকে বোনের পরিচয়ে অকৃত্রিম ও উজাড় দেখতে চেয়েছিলেন। প্রথমে কিছুটা আমতা আমতা করলেও আবিদ তাকে ভাইবোনের পরিচয়ের নিখাঁদতা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, আপু! ভাইবোনের সম্পর্কে কোনো ঝামেলা আছে? কী চমৎকার! যুগের ঘূর্ণিচাকায় প্রবাদের গাত্র বুঝি পিষ্ট হয়। পুরাতন প্রবাদের জায়গা দখল করে নেয় নতুন প্রবাদ- ‘পাতানো ভাইবোন যেখানে আপদ নেই সেখানে!’

আপদ মুক্তির নিশ্চয়তা পেয়ে পথে নামে নীলিমা। রওয়ানা হয় ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে মেলায়। নীলিমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায় আবিদ। এক জিঘাংসু প্রতিজ্ঞার প্রথম শিকার! সে তার টার্গেট পূরণ করতে পারবে তো? এগিয়ে চলে আবিদ। বুকে তার কম্পন, মনে উত্তেজনা আর চরিত্রে জিঘাংসার তাজা রক্ত।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবিদ হঠাৎ বলে ওঠে তার প্রকৃতির ডাক এসেছে। উসখুসে ভাব দেখায় সে। বিব্রত নীলিমা সংকুচিত হয়ে

পড়ে। তার কারণে ছোটো ভাইটি এই অসময়ে বিপদে পড়েছে, ভাবতেই কষ্ট লাগে তার। রিক্সা চলতে চলতে আবিদের হোস্টেলের কাছে এসে পড়ে। সে নীলিমাকে বলে, চলো হোস্টেলের কাছে এসে পড়েছি এখানে প্রয়োজনটা সেরে যাই! নীলিমা প্রথমে একটু ইতস্তত করে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। কিন্তু অবিদ বলে, ছি! এভাবে বড় বোনকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়? কথা বাড়ায় না নীলিমা। ইতস্তত বিক্ষিপ্তপদে আবিদের হোস্টেলকক্ষে প্রবেশ করে সে।

হোস্টেলে ঢুকে অবাক হয়ে যায় নীলিমা। গোটা হোস্টেল ভবনে সুনসান নিরবতা। যেন পিনপতনের শব্দও শোনা যায় বহু দূর থেকে। বোনকে নিজকক্ষে বসিয়ে তড়িঘড়ি করে বাথরুমে প্রবেশ করে আবিদ। বাথরুম থেকে বের হয়ে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই একেবারে ব্যঘ্র-ক্ষিপ্রতায় ‘বড়বোন’ নীলিমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবিদ। সে পকেট থেকে ছোরা ও ব্লেড বের করে বলে ‘চেঁচালে সোজা গলায় পাড় মারবো। গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিবো।’

নীলিমা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রতিরোধ ক্ষমতা নিস্তেজ হতে থাকে। ছিন্নবস্ত্রে ঘরে ফেরার অসম্ভব্যতার শঙ্কায় মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মতো বিছানায় ধপাস করে বসে পড়ে। পরের ইতিহাস যেমনি বেদনায়ক তেমনি মর্মান্তিক। আবিদ বড়বোনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার কথা বলে বাসে ওঠে। বাসের হেল্পারের সঙ্গে চুক্তি করে নেয় সুযোগ মতো তাকে

নামিয়ে দিলে একশত টাকা বকশিস দেবে। এভাবে চুক্তি করে গাড়িতে ওঠে নীলিমা-আবিদ। সিটে নিস্তব্ধ নীলিমা দূর আকাশের নীলিমাপানে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা ফোটে না তার মুখে। ভেতরে তার ঝড় বইছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমাজ-সংসারের প্রতি তার তীব্র ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। বাস কিছুদূর যাওয়ার পর বমির উদ্রেক দেখায় আবিদ। হেল্পার দৌড়ে আসে তাকে সাহায্য করার জন্য এবং বমি করানোর জন্য বাসের দরজার কাছে নিয়ে যায়। বমির ভাব করে এক পর্যায়ে বাস থেকে নেমে পড়ে আবিদ। হেল্পার বলে, উস্তাদ গাড়ি টান দেন। নীলিমার চোখের সামনেই ঘটছিল সব। 'ছোটোভাই'কে থামানোর নূন্যতম প্রচেষ্টা করে না নীলিমা। সে কাঠখণ্ডে পরিণত হয়েছে। তাই চোখের সামনে যা দেখছে তা এক নিষ্ঠুর খেলার মতো মনে হচ্ছে তার কাছে। খেলোয়াড়রা তো খেলবেই, বাঁশি বাজিয়ে তাকে মাঝপথে থামানোর দরকার কি? তাই আবিদের বমির ভাব, ভাব করে নেমে যাওয়া, নেমে যেতে হেল্পারের সহযোগিতা সবকিছুই ঠিকঠাক ধরতে পেরেছিলেন নীলিমা। কিন্তু প্রতারণার শিকার হয়ে নারীসত্তার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হারিয়ে এসে নতুন করে পাওয়ার কিছু না থাকায় কোনোকিছুতেই বাধা দেননি তিনি।

জিঘাংসার মোড়ক উন্মোচন করে ঘরে ফিরে এলো আবিদ। রাত তখন দশটা। হঠাৎ নীলিমার ছোটো বোনের নাম্বার থেকে একটা ফোন এলো, ভাইয়া! নীলিমা আপু তো এখনো বাড়ি আসলো না...

হ্যাঁ, এক অপার্থিব বিশ্বাসে চরম প্রতারিত হয়ে আর কোনো দিন ঘরে ফেরেননি নীলিমা। কোথায় হারিয়ে গেছে তারও খোঁজ রাখেনি কেউ। নীলিমার পরিবারের লোকেরাও তার সন্ধান জানতে পারেনি। আবিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে তারা। কেননা আবিদ প্রতিটি নারীর জন্য একটা করে নতুন সিম বরাদ্দ করত। ওই নারীর সম্ভ্রম লুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম্বারটাও বন্ধ হয়ে যেত চিরদিনের জন্য।

জিঘাংসা বাস্তবায়ন আর নিত্য নারীদেহের গন্ধ আবিদকে আরো বেয়াড়া করে তোলে। সে নতুন নতুন শিকারের পেছনে ছুটতে থাকে। ঘুণে ধরা এই সমাজে উঁইপোকার মতো আগুন দেখে ছুটে আসতে থাকে হতভাগা নারী। দ্বিতীয় শিকার হিসেবে পায় মা-বাবাহারা এক ইয়াতিম মেয়ে। মেয়েটি ভাইয়ের কাছে থাকে। আবিদ নূন্যতম পরিচয়ের সূত্রে তার কাছে মোবাইল নাম্বার চাইলে মেয়েটি বলে, আমিই কল দেবো আপনাকে। এরপর একদিন রাতে কল দিয়ে সে আবিদের বাসায় আসে। সাক্ষাৎ ও কথার প্রথম পর্বেই আবিদ তাকে ধর্ষণ করে। অনেক কান্নাকাটি করে মেয়েটি। সে বলে, 'আমি তো তোমাকে ভালোবাসিই, তোমার কাছে এমনিতেই আসব, এই কাজটা না করলেও পারতে! এই পাপের কারণে তোমার মুখ দেখাও অপরাধ।'

আবিদ বলে ঠিক আছে, তাই হবে। হবে না, এতো ভালোবাসা নয়; নারী বধের তামাশা! আবিদ নিজেই স্বীকার করে, কুমারী মেয়েদের ছেড়ে এরপর মহিলাদের দিকে নজর দিই। এদিকে রংপুরের ভিসা

অফিসে দালালের কাজ শুরু করে আবিদ। সেই সূত্রে গাজীপুরের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিদেশে পাঠানোর জন্য ভিসা করতে আসে এবং ওই দিন ভিসা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় আবিদকে 'বিশ্বাস' করে তার দায়িত্বে রেখে যায়। শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেয়া বোঝেন তো? কবি নয়; আমি এখানে নিরব...। এভাবে চলতে থাকে আবিদের নারীবধ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ....।

আবিদ জানায়, পনের ষোলোটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার পর ফেসবুকে যশোরের মেয়ে আখির সঙ্গে পরিচয় হয়। তার সঙ্গে আরেক ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ওই ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটিয়ে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক করি। আখির কথায় আমি ভালো হয়ে যাই। অন্য নারীদের সঙ্গে যেনার আক্রোশ কমে যায়। দুলো ভাইয়ের মাধ্যমে ছবি সংগ্রহ করি। পরে খুলনায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। হোটেলে তিন ঘণ্টা কাটাই।....করি, ...ধরে থাকি। এসময় তার ছবিগুলো তুলে রাখি। সে অস্বীকার করে, লাইট বন্ধ করে দেয়। রাতে কথা বলি। আসার সময় সে রাস্তাতেই আমাকে...ধরে। আমি তাকে বলি, আমি চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু জীবনটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। এখন এটা জীবন্ত রাখলে রাখতে পারো মারলে মারতে পারো। তবে এই সম্পর্কও স্থায়ী হয় না। আখির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে ঢাকায় আবার আগের পাপে জড়িয়ে পড়ে।

ঢাকায় সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়া নিয়ে প্রতিবেশি বিবাহিত মেয়েদের সম্ভ্রম লুটে নেয়ার জন্য অবলম্বন করত চরম

জঘন্যপন্থা। আবিদ নিজেই বলেছে, ‘ঢাকার ভালো ও অভিজাত ফ্যামিলিতে হাত দিতাম। এতে ঘটনা ফাঁস হওয়ার ভয় থাকত না। খারাপ হলে ফাঁস হওয়ার ভয়ে সেসব ফ্যামিলির সঙ্গে সম্পর্ক করতাম না।’

যারা ঢাকায় থাকেন তারা বোঝেন ঢাকার জীবন কতটা সংগ্রামমুখর। কতটা লড়াই করে এখানে টিকে থাকতে হয়। চাকরির স্বল্পতা, নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বমুখী গতি, এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে চার ঘণ্টা হাতে নেয়ার অপরিহার্যতা এবং বলাকা, সুপ্রভাত, তুরাগ, ৮নং, ২৭ নং গাড়ির আটত্রিশ সিটের গাড়িতে ৭০ জন করে উঠে ঝাঁকুনি খান আর ঘামে জবুথবু হয়ে যারা গন্তব্যে পৌঁছান, মাসে মাসে বাড়িওয়ালাদের তাড়া খেয়ে ভাড়া বাড়াতে গিয়ে চোখেমুখে অন্ধকার দেখেন, ত্রিশ দিনের ওপরের দিনওয়ালা মাসগুলো যাদের কাছে ভীমরুলের মতো হুল ফোটায়, তারা সমাজ-সংসারে যে কতটা করুণা পাওয়ার যোগ্য, তা একমাত্র বিবেকবান মানুষই বোঝেন। কিন্তু বোঝে না আবিদরা। তাই এরা হাত দেয় এসব সংগ্রামমুখর মানুষদের ঘরে, হাত দেয় তাদের সম্ভ্রমগাত্রে। উস্কে দেয় তাদের ঘরণীদেরকে, যাদের জন্যই এরা এই কঠিন জীবনযাপন করছে। সে এসব নারীদেরকে উত্তেজিত করে স্বামীরা তাদের সময় দিতে পারে না বলে! স্ত্রীদেরকে নিয়ে বিনোদন করে না বলে! বাচ্চাকেও সময় দিচ্ছে না বলে! স্ত্রীদেরকে সে এভাবে উত্তেজিত করত এবং শেষে টোপ ফেলে বলত, আসুন আমি সময় দিই, আপনাকে নিয়ে ঘুরি, পার্কে, বিনোদনকেন্দ্রে, চিড়িয়াখানায়...

হায়রে বেঈমান বধূ! তুই স্বামীর শুধু রোমান্টিকতারই কাঙাল থাকলি! ভাবলি না, স্বামী কেন ও কার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি করেন? রোমান্টিকতা কি শুধু বাক্যস্ফূরণেই! তোর জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে স্বামী যদি সারাদিন তোর পাশে বসে বসে রোমান্টিক কথার ঝুলি খুলে বসতেন তবে কি তাতে পেট ভরত? দেহের আবরণ হতো? ঢাকার অট্রালিকায় বসবাস ও গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির সহজলভ্য উপকরণে তোর সাংসারিক জীবন আনন্দঘন হতো? হতভাগ্য পথিক, প্রস্তরখণ্ডের পাষণ্ডতাকে ভাবে দুশমন, অথচ ভাবে না, প্রস্তরের পাষণ্ডতাতেই তার পথ কণ্টকাকীর্ণ মুক্ত! অন্যথায় নরম কাদার গর্তে আটকে যেত তার চলার পথ, হারিয়ে যেত অচেনা ঠিকানায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিও এইচ ও) ও ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জরিপ সংস্থা আরপিও ১৫০০০ মানুষের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, প্রযুক্তির কোপে তাদের দাম্পত্যজীবনে ছন্দপতন ঘটছে। দু'টি বিশ্বখ্যাত সংস্থার করা এই সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ক্যাথ মার্সার বলেছেন, 'বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে সাধারণ মানুষ এমনিতেই মানসিক চাপে থাকেন। চাকরি, রোজগার, সব মিলিয়ে চিন্তার শেষ নেই। মন সায় না-দিলে শরীর কাজ করবে কীভাবে?'

[টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য টেলিগ্রাফ ও বিবিসি অনলাইন]

জরিপ, রিপোর্ট, বিবেক সবকিছুই বলে কর্মক্লান্ত পুরুষ এখানে নিতান্তই অপরাগ। সারাদিনের এই খাটুনি খেটে ক্ষুধার্ত, ঘর্মাক্ত

স্বামীর পক্ষে খুব সঙ্গত কারণেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে কর্মক্ষেত্র বাদ দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে ঘুরতে যাওয়াও কোনো যুক্তিতে বৈধ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমাজের কতিপয় দুষ্ট, বেকার, লম্পট ও দুশ্চরিত্র লোক নারীদেরকে এই অসম্ভব কাজেই স্বামীদেরকে দোষারোপ করে তাদেরকে বিপথগামী করছে। প্রতিবেশি সূত্রে যখন তখন কর্মব্যস্ত পুরুষের খালি ঘরে ঢুকে নারীদেরকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বামী-অনুপস্থিত নারীর ঘরে প্রবেশ ও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মর্মান্তিক শাস্তির কথা হাদীসে বলা হয়েছে। ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন-

«مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ بُعِثَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَانٌ»

'যে ব্যক্তি স্বামী অনুপস্থিত রমণীর ঘরে উপবেশন করবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে তাকে দংশন করার জন্য একটি বিষাক্ত সাপ নিযুক্ত করবেন।' [মুসনাদ আহমদ : ২২৫৬২, যঈফ]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ প্রতিবেশি সূত্রের ভিত্তিতে কোনো নারীর দিকে অপদৃষ্টি দেয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন-

والجيران يأمن بعضهم بعضًا، ففى هذا من الظلم أكثر مما فى غيره، وجاره يجب عليه أن يحفظ امرأته من غيره، فكيف يفسدها هو . الكتاب : تفسير ابن تيمية

‘প্রতিবেশিরা একজন আরেকজন থেকে নিরাপদ থাকবে। ফলে প্রতিবেশির প্রতি জুলুম করা হলে তা অন্যদের প্রতি কৃত জুলুমের চেয়ে গুরুতর অন্যায়। সেহেতু প্রতিবেশির কর্তব্য হচ্ছে প্রতিবেশি নারীকে বহিরাগত লোকদের যে কোনো ক্ষতি থেকে হেফাজত করা। সুতরাং প্রতিবেশি নিজেই যদি ওই মহিলার দিকে হাত বাড়ায় তবে তা কী পরিমাণ ভয়াবহ অপরাধ হতে পারে?’

বিশ্বখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রতিবেশি নারীর সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া শুধু প্রতিবেশির হক নষ্ট করাই নয়, বরং অন্য সাধারণ যেনার চেয়ে এটা অধিকতর গুরুতর। কেননা,

وزنا الثيب أقبح من زنا البكر

‘কুমারী মেয়ের চেয়ে বিবাহিত নারীর সঙ্গে অপকর্ম করার অপরাধ ভয়ানক।’ [তাফসীরে রুহুল মাআনী]

মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ মুস্তাফা আদাবী মিসরী বলেন-

مع أن كل الزنا حرام، لكن لأنك انتهكت حرمتين: حرمة الفرج المحرم، وحرمة الجار فكان التغليظ أشد.

‘সকল প্রকার যেনাই ভয়াবহ পাপ। কিন্তু প্রতিবেশি নারীর সঙ্গে তা অত্যন্ত কঠিন। কেননা এখানে দুটি হারাম কাজ বিদ্যমান। হারাম উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং প্রতিবেশির অধিকার ক্ষুণ্ন করা। তাই এটা অন্য ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক। [সিলসিলাতুত তাফসীর]

মুফাসসির আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ জায়েদ ‘আলজাওয়াহিরুল হারিরিয়া মিন কালামি খায়রিল বারিয়া’ তাফসীর গ্রন্থে বলেন-

والزنا بحليلة الجار وهو داخل في الزنا والنهبة والغلول

‘প্রতিবেশি নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় একই সঙ্গে তিনটি গুনাহ সম্মিলনের কারণ। যথা, যেনা, ডাকাতি ও প্রতারণা।’

প্রতিবেশি নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার সংস্কৃতি আমাদের এই তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজে নিদারুণভাবে ব্যাহত হলেও যে জাহেলী যুগকে আমরা ঘৃণা করি সেই জাহেলী যুগেও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা রক্ষা করা হতো। বিশ্বখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন-

والزِّنَى - وإنْ كان من الكبائرِ والفواحش - لكنَّه بحليلة الجارِ أفحشُ وأقبح؛ لما ينضمُّ إليه من خيانةِ الجار ، وهَتْكِ ما عظَّم الله تعالى ورسولُهُ مِنْ حرمته ، وشِدَّةِ قبح ذلك شرعًا وعادة ؛ فلقد كانتِ الجاهليةُ يتمدَّحون بصون حريمِ الجارْ ، ويَغُضُّون دونهم الأبصارْ ؛ كما قال عنترة :

‘যে কোনো যেনাই অত্যন্ত জঘন্য ও অমার্জনীয় অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিবেশি নারীর সঙ্গে তা করা অনেক কারণেই মারাত্মক। কেননা এতে প্রতিবেশির হকের খেয়ানত, আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলের গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ লঙ্ঘনের মতো ধৃষ্টতা বিদ্যমান। তাছাড়া এই পাপটি শরীয়ত ও সামাজিকবোধ- উভয় দৃষ্টিতেই অত্যন্ত নিন্দীয় ও জঘন্য। একারণেই জাহেলী যুগের লোকেরাও প্রতিবেশির ইজ্জত-

আব্রু রক্ষা করাকে নিজেদের গৌরবজনক কাজ বলে মনে করত। আনতারা কবি বলেন-

وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي
حَتَّى يُوَارِيْ جَارَتِي مَأْوَاهَا

‘যখনই আমার প্রতিবেশি নারী আমার দৃষ্টিতে উদয় হয় তখনই আমি দৃষ্টি সংযত করি এবং যতক্ষণ না সে তার আবাসস্থলে প্রত্যাগমন করে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি বন্ধ রাখি।’ [আল মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম]

বড্ড আফসোস! জাহেলী যুগের লোকেরা সৌজন্যবোধ লালন করেও ‘জাহেল সভ্যতার’ অপবাদ ঘোচাতে পারেনি। কিন্তু আমরা সৌজন্যবোধ, শালীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েও ‘সভ্য যুগের সভ্য নাগরিক’ তকমা লাগিয়ে অতীতকালের গায়ে কলঙ্কের দাগ লাগিয়ে ইতিহাসের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছি!

এই ছড়ি ঘুরিয়েই আবিদ কারো কন্যা, কারো বোন, কারো মা, কারো স্ত্রীর সম্ভ্রমহানী করে। একজন, দুইজন, তিনজন... তেতাল্লিশজন নারী হয় তার জিঘাংসা ও সম্ভ্রমহানীর শিকার।

আবিদ ফিরে এসেছে কিনা তা জানি না। তবে আল্লাহয়ী আজাবের ঝলক কিঞ্চিত হলেও তাকে তাড়া করেছে। মাত্র এক রাতের মধ্যেই তার দুই হাত সহ শরীরের প্রায় গোটা অংশ শ্বেত হয়ে যায়। চিকিৎসগণ বিস্মিত হয়ে বলেছেন এই শ্বেত রোগ এত দ্রুত এক রাতের মধ্যে হওয়া সত্যি বিস্ময়কর!

## একটি জরিপ ও নৈতিক দৈন্যের চিত্র

একই সঙ্গে আশ্চর্যজনক এবং হতাশাজনক এক ফলাফল উঠে এসেছে জাতিসংঘের জরিপে। বাংলাদেশ, চীন, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং পাপুয়া নিউগিনির মোট ১০,০০০ পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে, তাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই কোনো না কোনো সময়ে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর ওপর জাতিসংঘের বড় আকারের জরিপ এটাই প্রথম। জরিপের ফলাফল থেকে অনুমান করা যায়, এশিয়ার এ দেশগুলোতে শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা কতটা বেশি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, ৬টি দেশের ১০,০০০ পুরুষের এক-চতুর্থাংশ নিজেরাই স্বীকার করেছে ধর্ষণের কথা।

প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে ধর্ষণ হরহামেশাই হয়ে থাকে। ১০ জনে ১ জন সম্পর্কের বাইরেও অন্য নারীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করেছে। জাতিসংঘের এ জরিপকাজে নেতৃত্ব দেয়া সাউথ আফ্রিকার মেডিকেল রিসার্স কাউন্সিলের রেচেল জিউকেস বলেন, এটা এখন পরিষ্কার, সাধারণ জনগণের মধ্যে নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা আমাদের ধারণার তুলনায় অনেক গুণ বেশি। গবেষকরা বলছেন, জরিপের ফলাফলের প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতনের বিষয়ে আমাদের বর্তমান ধারণায় পরিবর্তন আসা উচিত এবং সে মোতাবেক জরুরি পদক্ষেপ নেয়া উচিত, যেন এটাকে প্রতিহত করা যায়। একই ধরনের জরিপ এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় করা হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে ৪০ শতাংশ পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করেছে।

জরিপ ফলাফল রচয়িতারা বলেন, এ ৬টি দেশে এ রকম ফলাফলের পেছনে জৈবিক কামনা চরিতার্থ করার পাশবিক প্রবণতা অন্যতম কারণ। তবে পুরুষদের এ রকম সহিংস আচরণের পেছনে অন্য কারণও রয়েছে। যেসব পুরুষ ছেলেবেলায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিশেষ শ্লীলতাহানী করার নির্যাতন; তাদের দ্বারা ধর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। গবেষকরা এটাও উল্লেখ করেছেন, এ জরিপের ফলাফল সমগ্র এশিয়া এবং প্যাসিফিক এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। পাপুয়া নিউগিনির ৬২ শতাংশ পুরুষ জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশের শহরগুলোতে গ্রাম্য এলাকার তুলনায় ধর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে। ৯.৫ শতাংশ পুরুষ শহরে এবং ১৪.১ শতাংশ গ্রাম্য এলাকায় ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। [তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট, বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীর পরিবারে অন্তত চারজন পুরুষ রয়েছে। বাবা, ভাই, স্বামী ও ছেলে। ভাবতেও ভয়াবহ লাগে যে এদের একজন ধর্ষক হয়ে উঠতে পারে। সহকর্মী, প্রতিবেশি, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, চেনাজানা, আত্মীয়, পরমাত্মীয় পুরুষদের চেহারা মনে পড়ছে আমার। তাদের মধ্যে প্রতি চারজনে একজনের কি ধর্ষক হওয়া সম্ভব?

খবরটি নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে অনেকেরই। যাদের চোখ এড়িয়ে গেছে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এশিয়ার ছয়টি দেশে চালানো এক

জরিপের ফলাফল বলছে, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন পুরুষ জীবনে ধর্ষণের মতো অপরাধ করেছেন।

ওই ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ নামে প্রতিষ্ঠানের চালানো জরিপে আরও দেখা যাচ্ছে নারীরা তাদের ঘনিষ্ঠজন দ্বারাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বেশি। পরিসংখ্যানের হিসেবে চারজন মানে অবশ্যই এই নয় যে প্রতি পরিবারে কেউ না কেউ ধর্ষক হবে। দশটি পরিবারে একজন ধর্ষকও না থাকতে পারে আবার একটি পরিবারের সকল পুরুষই ধর্ষক হতে পারে?

না, বাংলাদেশের পুরুষরা এখনও পাপুয়া নিউগিনি, চীন, কম্বোডিয়ার পুরুষদের মতো ‘খারাপ’ হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু তারপরেও অচেনা নারীকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই হার গবেষকদের অনুমানের চেয়ে বেশি।

খবরটি পড়ে আমাদের প্রথমে মনে হয়েছে, না না এটা অসম্ভব, আমাদের দেশের মানুষ কখনও এত খারাপ হতেই পারে না। কিন্তু কথাটি মুখে উচ্চারণের আগেই মনে পড়েছে সংবাদপত্রের বেশ কয়েকটি শিরোনামের কথা। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণ, প্রতিবেশি যুবকের দ্বারা শিশু ধর্ষণ, কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে গার্মেন্টসকর্মী ধর্ষণ, বখাটেদের দ্বারা কিশোরী ধর্ষণ, আত্মীয় দ্বারা গৃহবধূ ধর্ষণ, প্রেমিক কর্তৃক দলবল নিয়ে প্রেমিকাকে গণধর্ষণ, গৃহকর্তা কর্তৃক গৃহকর্মী ধর্ষণ, ‘দ্বারা’, ‘দিয়া’, ‘কর্তৃক’, ‘এ’- করণ কারকে সকল বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় সংবাদ শিরোনামে। এমন

একটি দিনও যায় না যেদিন কোনো না কোনো নারীর ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর না থাকে।

আমাদের 'ভালো' পুরুষদের এই কীর্তিগুলোর কথা মনে পড়ায় তাদের পক্ষে বলার যুক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল। বরং মনে হলো জরিপে যা বলা হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। মনে পড়ছে ম্যারিটাল রেপের কথা, মনে পড়ছে চারদেয়ালের ভিতর সংঘটিত অসংখ্য ধর্ষণের কাহিনি যেখানে সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়ে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কেঁদে গেছে। জরিপের বাকি পাঁচটি দেশের পুরুষদের কথা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের পুরুষদের কথা একটু আলোচনা করা যাক।

কেন এদেশের পুরুষদের মধ্যে এই ধর্ষণপ্রবণতা? এটা কি নারীর অধস্তন অবস্থানের কারণে? আমার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় নারীর বর্তমান বিশ্বজনীন অবস্থান ও মানসিকতা। নারী যখনই নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ বা সর্বক্ষেত্রে পুরুষদেরকে টক্কর ও টেক্কা দেয়ার পরিকল্পনা আঁটছে, তখন থেকেই তারা পুরুষের ব্যবহারসামগ্রী ও লাঞ্ছনাকর নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ধর্ষণের প্রবণতা জঘন্যমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইসলামের আদর্শ ও ভাবনা এবং নারীর প্রতি ইসলামপ্রদত্ত সম্মান প্রদানে অনীহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ধর্ষণের সংখ্যাধিক্যের একটি মূল কারণ হল ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও তার কঠোর ও যথাযথ প্রয়োগের অভাব। অপরাধের সংঘটন এবং তার শাস্তি বাস্তবায়নের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব। ধর্ষণের

শিকার একজন নারী যে মেডিকেল পরীক্ষার সম্মুখীন হন তা দ্বিতীয়বার ধর্ষিত হওয়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। নারীর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নেই কোনো নারী চিকিৎসক।

ফলে ধর্ষণের শিকার ট্রোটাইজড একজন নারী ও তার অসহায় আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় পরীক্ষার ধরন দেখেই আর আইনের আশ্রয় নিতে চান না। তারা মনে করেন, 'যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, আর কেন দ্বিতীয়বার হয়রানি হওয়া'। ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা, তার আইনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া এত বিঘ্নময় ও দীর্ঘসূত্রীতা- সামাজিক সংকোচ কাটিয়ে ওঠা এতই কঠিন এবং আইনের সাহায্য পাওয়ার প্রক্রিয়া এত গ্লানিকর যে, মেডিকেল পরীক্ষা, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারির ঝক্কি পোহাতে আর চান না অভিভাবকরা।

তাছাড়া অধিকাংশ ধর্ষণের শিকার নারী দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় আইনের আশ্রয় নেওয়া বা তার ব্যয় বহন করা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। তার ওপর থাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য প্রভাবশালী ধর্ষকের ভয়ভীতি প্রদর্শন। যা অনেক ক্ষেত্রে শুধু ভয় দেখানোতে থেমে না থেকে ধর্ষিতার পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর হামলায় পর্যবসিত হয়।

ধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের দেশে ধর্ষণের সংখ্যাধিক্যের একটা বড় কারণ। ধর্ষণ যে একটি গুরুতর আইনগত অপরাধ এবং এর কঠোর শাস্তি রয়েছে তা ধর্ষণকারীর মনে জায়গা করে নেয়নি এখনও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণকারী মনে করে

নির্যাতনের শিকার নারীটি মুখই খুলবে না এবং এই অপরাধের কোনো বিচার বা শাস্তি হবে না। আর একবার ধর্ষণ করে শাস্তি এড়াতে পারলে তার মধ্যে দ্বিতীয়বার অপরাধ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহিতা কিংবা নারীর সতীত্বহানীর ভয়াবহ পাপ ও অপরাধবোধ মোটেই কাজ করে না।

আবার দেখা যায়, গ্রাম্য সালিশে শরীয়তের পরিভাষা কিংবা শরীয়তের নামে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ধর্ষককে সামান্য জুটাপেটা বা অর্থ জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিরস্কার করা হয় ধর্ষণের শিকার নারীকেই। অথচ বিষয়টি যদি ব্যভিচার না হয়ে কেবলই ধর্ষণ হয়, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নারীকে জবরদস্তিমূলক এবং প্রকৃতই তার অনিচ্ছায় কাজটি সংঘটিত করা হয় তবে সে নিন্দা কিংবা তিরস্কারের যোগ্য নয়। আবার কখনও কখনও ধর্ষকের সঙ্গে ভিকটিমের বিয়ের আয়োজন করা হয়। এ সবই গুরুতর অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করে জনমনে একে একটি হালকা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

ভিকটিমের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও খুবই অনুদার ও প্রতিকূল। কোনো নারী ধর্ষণের শিকার হলে সমাজে তার অবস্থান হয়ে পড়ে ভীষণ নাজুক। অবিবাহিত হলে ভবিষ্যতে তার বিয়ে হওয়া দুষ্কর হয়। আর বিবাহিত হলে স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়নের আশঙ্কা থাকে প্রবল। সমাজে সর্বত্র নারীটিকে হেয় চোখে দেখা হয়।

ফলে গুরুতর আহত না হলে ভিকটিম ও তার পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনা চেপে যাওয়া নিরাপদ বলে মনে করে। দেশের

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত নারীদের প্রতিও এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুদারই থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্বই দশকের শেষার্ধে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

এমনকি সম্প্রতি ভিকারুন নিসা স্কুলে যে সাহসী মেয়েটি নির্যাতনের বিচার চেয়েছে, তার আগে অন্য যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা কিন্তু সাহস করে মুখ খুলতে পারেনি। নারীর প্রতি সামাজিক অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ভিকটিম সাহস করে বিচার চায় না, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ধর্ষক আর বাড়তে থাকে অপরাধ সংঘটনের সংখ্যা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই। নারীর পোশাক-আশাক যে পুরুষকে প্রলুব্ধ ও পাপকর্মে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রাখে তার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্তমানের ব্যভিচারের আধিক্য। আজ সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ক্রিয়া কাজ করছে যে, ‘মেয়েরা যেমন পোশাক-আশাক পরে তাতে শুধু পুরুষের আর দোষ কী, তারা তো প্রলুব্ধ হবেই।’

তবে পোশাক-আশাক ধর্ষণ ও ব্যভিচারের অনুকারণ হলেও মূল কারণ নয় অবশ্যই। কেননা ধর্ষণের মাত্রা শুধু তরুণী কিংবা যুবতীদেরকেই আক্রান্ত করছে না; বরং তিন, চার বা পাঁচ বছরের শিশুরাও তো ধর্ষিত হচ্ছে। তাদের পোশাকের শালীনতা আর অশালীনতার কী আছে?

আরও একটি কথা এই যে, নারী-পুরুষে বর্তমানে চলছে স্নায়ু যুদ্ধ। মেধায়, যোগ্যতায় এবং ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নে নারীরা পুরুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা অদৃশ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যা পুরুষের সঙ্গে নারীর স্নায়ুযুদ্ধ বললেও ভুল হবে না। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে ধর্ষণ খুব কম কম ক্ষেত্রেই ঘটে। অধিকাংশ ধর্ষণের পেছনে কাজ করে নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকামিতা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মানসিকতা।

ধর্ষণের মতো অপরাধকে সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য প্রথমেই চাই আল্লাহর বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন ও শরঈ আইনের কঠোর প্রয়োগ। দ্বিতীয়তঃ ভিকটিমের আইনগত আশ্রয় গ্রহণের পদ্ধতি সহজ করা এবং বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়ায় তার প্রবেশাধিকার। তৃতীয়ত, নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন ধর্ষণকারী কিন্তু ভিনগ্রহ থেকে আগত কোনো জীব নয়, সে আমাদেরই কারও না কারও আত্মীয়, কারও না কারও সন্তান, কারও ভাই, কারও স্বামী। শৈশব থেকেই যেন পরিবারের ছেলে সন্তানটি নারীকে সম্মান করতে শেখে, তাকে সমপর্যায়ের ভাবতে শেখে। ইসলামী তালিম-তারবিয়াত ও নারীকে সম্মান করার শিক্ষা যদি সে পরিবার থেকে পায়, নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে না ভেবে সে যদি ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে ও সম্মান করতে শেখে, অধীনস্থ না ভেবে নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তি হিসেবে

তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দিতে শেখে তাহলে সে কখনও ধর্ষণকারী হয়ে উঠবে না।

ধর্ষণ নারীর একার সমস্যা নয়। এটা গোটা সমাজের সমস্যা, রাষ্ট্রের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দায় যেমন রাষ্ট্রের, তেমনি প্রতিটি নাগরিকের। প্রতি চারজনে একজন নয়, দেশের একজন পুরুষকেও ধর্ষক হিসেবে দেখতে চায় না বাংলাদেশ।

নারী ধর্ষণ এবং যেনা-ব্যভিচার আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ অনৈতিকতা, ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের নিদারুণ অভাব এবং নারীর ঘর ছেড়ে বাইরে আসা। এই সমস্যাগুলো দূর করতে না পারলে আমরা হারাবো আমাদের মুসলিম পরিচয়। জাতিসংঘের জরিপে এদেশের জনগণ শুধুই পরিচিত হবে ধর্ষক হিসেবে। প্রতি চারজনে যদি একজন ধর্ষক থাকে তবে 'কে ধর্ষক নয়?' এই প্রশ্ন বিব্রত ও লজ্জিত করবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে! নারীসত্তা যদি তার আপন নীড়ে বেড়ে ওঠে স্বমহিমায় তবে বেঁচে যাবে তারা নিজেরা; বাঁচবে পুরুষরাও!

## বিশ্লেষণহীন জীবন

দুই ডালে পা দেয়ার প্রবাদ সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি। অর্থাৎ একই সময়ে অসম্ভব দুই পন্থা অবলম্বন করা। এ নিয়ে প্রবাদ মনে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফলাফল শূন্যতার দিকনির্দেনা করা। জীবনপথের এই বাঁকাগলি দিয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে তো পৌঁছানো সম্ভব হয় না এবং ফলাফল তো আসেই না উল্টো দুই পা দুই দিকে যাওয়ায় জীবনটাই শেষ পর্যন্ত বাঁচানো দায় হয়ে যায়। একটি হাস্যকর ঘটনা দিয়ে বিষয়টাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি। অসংলগ্ন জীবনের বিষ্ফল 'প্রেমের দুই পা' মানুষের জন্য কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে সে কথাটাই পাঠকদেরকে জানাতে চাই।

বস্তুত প্রেম-ভালোবাসার কোনো পথেই শান্তি নেই। এই পথ মসৃণ নয় এবং ছিলও না কখনও। কিন্তু এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় দুই ডালে পা দেয়ার মতো ঘটনা, তাহলে তো কথাই নেই। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল তথাকথিত সভ্যতার আঁতুড়ঘর ইউরোপের কোনো এক দেশে। ওই দেশের পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি এক ডাক্তার মহিলাকে ভালোবাসতেন। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক চলমান থাকার পর হঠাৎ তাতে ভাটা পড়ে। জোয়ারের পানি অন্য নালায় প্রবাহিত হয়। পুরুষ লোকটা দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে ছেড়ে আরেকজনের সঙ্গে প্রেমের নতুন ঘাট বাঁধেন।

এভাবে বেশকিছু দিন চলার পর প্রেমিক লোকটা দন্ত সমস্যায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য বেছে নেন তার পূর্বের প্রেমিকাকে। বাসি প্রেমিকা একটা সুন্দর সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বিনা

কষ্টে সেই সুযোগটা হাতে আসায় বেশ পুলকবোধ করেন তিনি। চিকিৎসার জন্য রোগীকে অপারেশন রুমে নিয়ে যান। অতপর মুখ অবশ করার জন্য ইনজেকশন পুশ করেন। অনেকক্ষণ পর রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি দেখতে পান, মুখে তার ইয়া বড় একটা ব্যান্ডেজ। অনেক ব্যথা পাচ্ছিছেলেন তিনি। আর ব্যান্ডেজটা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় আকারে অনেক বড়। তখনই তিনি সন্দেহে পড়ে যান। একটু পর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দেখেন সেখানে একটি দাঁতও অবশিষ্ট নেই। যেখানে মাত্র দু'তিনটে দাঁত ফেলে দেয়ার কথা সেখানে গুণে গুণে তার বত্রিশটি দাঁতই ফেলে দেয়া হয়েছে!

তিনি অপচিকিৎসার বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক ইছাকৃতভাবেই এরূপ করা হয়েছে বলে জানান। চিকিৎসক আরো জানান, প্রতারক লোকটাকে সামনে পেয়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারিনি। তাই সবগুলো দাঁত তুলে ফেলেছি! আদালত তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিলেও প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে পারায় তিনি বেজায় খুশি বলে জানিয়েছেন।

এদিকে প্রেমিকের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, একজন পেশাদার চিকিৎসক হিসেবে তার কাছে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু সে যে আমার এই সর্বনাশ করবে তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি। তার আক্ষেপ এখানে এসে থেমে থাকেনি। দ্বিতীয় প্রেমিকাও দন্তহীন লোকটাকে ছেড়ে গেছেন। ফলে প্রেমে পরাস্ত, পরকীয়ায় ব্যর্থ এই লোকটি আল্লাহপ্রদত্ত ৩২টি দাঁত হারিয়ে নিদারুণ কষ্টেই দিনযাপন করছেন আর কী!

কিছুদিন আগে আরেকটি হাসির গল্প প্রকাশ পেল। সংবাদটির শিরোনাম ‘এসএমএস আড়াল করতে ফোন গিলে খেলো গার্লফ্রেন্ড!’ সংবাদে প্রকাশ, বেশ কিছুদিন আগে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ফোন ধরায় বান্ধবীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করেন এক মার্কিন নাগরিক। সেই ঘটনা রীতিমতো ঝড় তোলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। এই পথ ধরে ঘটলো তার চেয়েও অদ্ভূত ঘটনা। ব্রাজিলিয়ান এক নারী তার বয়ফ্রেন্ডের কাছ থেকে মোবাইলের এসএমএস আড়াল করতে পুরো ফোনটাই গিলে ফেলেন!

১৯ বছর বয়সী আদিয়ানার কাছ থেকে তার বয়ফ্রেন্ড এসএমএস চেক করার জন্য মোবাইল চাইলে আদিয়ানা ছুটে পালিয়ে যান এবং কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা না করে মোবাইল সেটটাই গিলে ফেলেন। এরপর অপারেশন করে তার পেট থেকে ফোনটি উদ্ধার করা হয়।’

এসব ঘটনায় জীবন বিশ্লেষণের উপকরণ আছে কতটুকু, সেই বিতর্ক হতেই পারে। আমাদের জীবনের সঙ্গে এধরনের ঘটনার সংশ্লিষ্টতাই বা কতটুকু সে প্রশ্নও উত্থাপিত হওয়া অবান্তর নয়। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এসব হাসি-তামাশার গল্পের ফাঁদেই আটকে আছে আমাদের আধুনিক সভ্যতার এই চলমান যান্ত্রিকজীবন। এই জীবনে দায়বদ্ধতার চেয়ে আবেগ বেশি, সততার চেয়ে বেশি ভ্রষ্টতা। এই ভ্রষ্টতার সম্মোহনে আমরা অনেক আগেই হারিয়ে এসেছি আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

বৃদ্ধ লোকটি প্রেম ও পরকীয়া করতে গিয়ে বত্রিশটি দাঁত হারিয়ে গল্প ও হাসির উদ্রেক করেছেন বটে, তবে এর আড়ালে লুকিয়ে

আছে মানবসভ্যতার মনুষ্যত্ব হারানোর বেদনা ও কান্না। ১৯ বছর বয়সী মেয়েটি এক অবৈধ প্রেম বাঁচাতে গিয়ে আরেক অবৈধ প্রেম আড়াল করার চেষ্টা হিসেবে যা করলেন, তা কেবল হাসির উদ্রেককারী ঘটনাই নয়; আমাদের দ্বিচারিণী সমাজ ব্যবস্থার একটি ছোট্টো উদাহরণও বটে। আমাদের জীবন-গল্পের 'সূচনা' কি এই হাসি আর 'পরিণতি' কান্নার মধ্য দিয়ে শেষ হবে?

## চাঁদে হাত!

যাযাবর লিখেছেন ‘হর্স পাওয়ার দিয়ে ইঞ্জিনের দাম বাড়ে, সিলিন্ডার দিয়ে মোটর গাড়ির। হীরার মুল্য দ্যুতিতে, চাপরাশির তার তকমায়। সাবালক বাঙালীর দাম নিরুপিত হয় চাকরির ওজনে।’ কথাটা সত্য। আমাদের সমাজে চাকুরে ছেলের যে কি দর তা বেশির ভাগ মেয়ের বাবাদের ব্যবহারেই জানা যায়। পৃথিবীর সব থেকে খারাপ ছেলেও যদি ভালো একটা চাকরি করে তবে চাকরি তার সব দোষ ঢেকে নেয়। মানে ছেলে মদখোর, নেশাখোর, মেয়েবাজ যাই হোক না কেন চাকরির জন্য তার সাত খুন মাপ। মেয়ে পক্ষ থেকে তার দোষ গুলোর সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা বেরোয়। যেমন, মদ তো আজকাল হাই সোসাইটির সবাই খায়, মদ না খাওয়া মানে তো মান্ধাতা আমলের ছেলে। একটু আধটু তো খাবেই! আর চারিত্রিক অধঃপতনের ব্যাখ্যায় বলে, ‘বিয়ের আগে কে না মেয়েবাজ হয়? আমরাই তো কত মেয়ের পেছনে ঘুরেছি। বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে!’

জুয়া খেলা, লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা, খারাপ ভাষায় গালি দেওয়া এসব বিয়ের আগে ছেলেরা করেই থাকে। বিয়ের পর দেখবা কেমন লাইনে চলে এসেছে।

এরকম করে সব দোষ গুলোর ব্যাখ্যা মেয়ে পক্ষ থেকেই বেরিয়ে আসে। টাকা দেখে চরিত্র, ভদ্রতা, ব্যক্তিত্ব সবকিছুকেই দূরে ঠেলে দেয় অথবা নজরান্দাজ করে অনেক মেয়ের বাবা-ভাইয়েরা। আশ্চর্য লাগে এদের থিওরি দেখে। এরা টাকাকেই সুখের একমাত্র উপায় বলে মনে করে। এদের কাছে ভালো ব্যবহার, আদর্শ ও চরিত্রের

কোনো দাম নেই। এরকম অবিভাবকরা কত মেয়ের যে জীবন নষ্ট করে তার ইয়াত্তা নেই!

অথচ হাদীসে অর্থ ও রূপের আগে দীন ও সততা দেখে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

‘তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার মেয়ে মুশরিক মেয়ের চেয়ে উত্তম। যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার পুরুষ মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আর আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলি সুস্পষ্ট তুলে ধরেন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১}

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। তবে তোমরা ধার্মিকতার দিক বিবেচনাই অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে। [ বুখারী : ৫০৯০; মুসলিম : ১৪৬৬]

আরেক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

'যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিবাহ দাও। অন্যথায় পৃথিবীতে ফিতনা হবে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেয়া দেবে।' [তিরমিযী : ১০৮৩, হাসান]

বস্তুতঃ সৎ চরিত্রই হচ্ছে দীনের প্রতীক এবং মুমিনের সৌন্দর্য। কেবল বদৌলতেই মানুষ মর্যাদার শিখরে উন্নীত হয়। আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ»

‘(কিয়ামত দিবসে) ওজনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে অন্য কোনো বস্তু ভারি বলে প্রমাণিত হবে না। আর একজন চরিত্রবান লোক নিয়মিত সাওম ও সালাত আদায়কারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।’ [তিরমিযী : ২০০৩, সহীহ]

কিন্তু যাযাবরের কথায়, চাকরির বাজারে যেমন সার্টিফিকেটের অপরিহার্যতা, বিয়ের বাজারেও তেমন অর্থের অপরিহার্য দেখা দিয়েছে। মানুষ যোগ্যতার বিচার করছে অর্থে। একজন মেয়ের বাবার কথায় ফুটে উঠেছে এই শ্বাশ্বত সত্য। ঘটনাটাও মজার!

রাজধানী ঢাকা থেকে শিবগঞ্জে পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়ে এক প্রেমিকযুগল। পরে তাদের আটক করে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ। আটকের পরও তারা নির্বিকার। প্রেমবাসনায় মগ্ন। থানায় গিয়ে দেখা যায়, আটক অবস্থায় প্রেমিক জুটি ওসির রুমে হাতে হাত রেখে আলাপচারিতায় রত। কিন্তু তখনই বাঁধল গোল। এসময় সেখানে হাজির হন মেয়ের শিল্পপতি বাবা নাঈদ আহম্মেদ সিদ্দিকী। তিনি ঢাকা থেকে হেলিকাপ্টার ভাড়া করে যান শিবগঞ্জ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক নুরুল ইসলামও যান মেয়ের বাবার সঙ্গে। সেখান থেকে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় ফেরত এসে অপহরনের অভিযোগে প্রেমিককে ধানমন্ডি থানায় সোপর্দ করেছেন। আটক প্রেমিক যুগল হলো ধানমন্ডি এলাকার নাঈদ আহম্মেদ সিদ্দিকীর মেয়ে সাদিয়া আহম্মেদ শশী (১৫) এবং মোহম্মদপুর থানার আ. রাজ্জাকের ছেলে রাসেল খান (২৪)। শিবগঞ্জ থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ শে অক্টোবর ঢাকা থেকে পালিয়ে

শিবগঞ্জে যায় শশী ও রাসেল। সেখানে থানা পুলিশের হাতে আটক হয়। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্মক (এসআই) নুরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৬ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৪৯ হাজার টাকা সহ শিবগঞ্জ থানার মাধ্যমে অপহৃত শশি ও অপহারনকারী রাশেল কে আটক করে ধানমন্ডি থানায় নেয়া হবে। অপহৃত মেয়েটিকে তার পিতার কাছে হস্তান্তরের পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। মেয়েটির পিতা জানান, ঘরে নেই শোয়ার চৌকি আবার হাত দিছে চাঁদের দিকে!

সমস্যাটা এখানেই। প্রেম ধনী-গরিব মানছে না। আবার মেয়েদের বাবাদের দৃষ্টিতে সততায় নয়, অর্থে আবদ্ধ। রাসেল খানের সৌভাগ্যই বলা যায়। প্রেম করে না জিতুক, অন্তত প্রেমের উসিলায় উড়োজাহাজের ভ্রমণটা তো হয়ে গেল!

# আধুনিক সভ্যতা না উৎকর্ষ?

জীবন ও বাসনার এক পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার এই আধুনিক সভ্যতা। আধুনিকতার সঙ্গে 'সভ্যতা' শব্দ যোগ করে এই পাগলা ঘোড়াকে করা হয়েছে আরও বেগবান। এই যোগসূত্রের ভিত্তি ও সত্যতা কতটুকু- দিন দিন এই প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠছে। আধুনিকতার চক্রে সভ্যতা তো ক্রমশঃ পিষ্ট হচ্ছে। তবে আধুনিকতার সঙ্গে সভ্যতার এই সখ্যতা কেন? হ্যাঁ, মানুষ জীবন উপভোগের পর্যাপ্ত রসদ ও উপকরণ পেয়েছে- একথা সত্য। কিন্তু সেটা খুব জোর 'উৎকর্ষ' নামে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু আধুনিকতার নামে আজ যা চলছে সেটাকে কোনোভাবেই 'সভ্যতা' হিসেবে মেনে নেয়া যায় না।

অবশ্য ভদ্রতা নামে একটা শব্দ আছে। অভিধানে এর একটা সৌজন্যমূলক অর্থ থাকলেও মানুষের ব্যবহারিক অভিধান কখনও কখনও বইয়ের অভিধান অতিক্রম করে যায়। তাই কখনও কখনও 'ইংরেজ ভদ্রলোকটা কাজটা করেছে' বললে, একজন নষ্ট লোকের চিত্রই সামনে ভেসে ওঠে। বৃটিশদের অত্যাচার ও দুরাচার যখন সীমা ছাড়িয়েছিল, তখন ভারত উপমহাদেশের মানুষ 'ভদ্র' শব্দটাকে অভিধানের খাঁচা থেকে খুলে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছে। চামড়া বাঁচানোর জন্য মুখে ভদ্রলোক বললেও, ভেতরে ভেতরে বলেছে 'পিশাচ'। সম্ভবত আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে 'সভ্যতা' শব্দটিও একই ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে। নইলে আজ আধুনিক

সভ্যতার নামে যা হচ্ছে, তাতে তো খোদ শব্দটাই পারলে বিলাপ করে! ভাগ্যিস, শব্দের অর্থ আছে- প্রাণ নেই!

**আধুনিক সভ্যতার একটা নজির দেখুন!**

'বাড়ির ভাড়াটিয়া কলেজপড়ুয়া ছাত্রীর নগ্ন দৃশ্য ভিডিওতে ধারণ করার অভিযোগে প্রিতম ও শুভ নামে দুই শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুরে। ৪৯২/২ নম্বর ইব্রাহিমপুরের বাসা থেকে প্রিতমকে আটক করার পর তার দেয়া তথ্যানুযায়ী পাশের বাড়ি থেকে ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী শুভ (১৯)-কে পুলিশ আটক করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ইব্রাহিমপুরের নুরুল ইসলামের পাঁচতলা বাড়ির নিচের তলায় গত পাঁচ বছর যাবৎ ভাড়াটিয়া হিসেবে বাস করছে কলেজছাত্রীর পরিবার। বাড়ির মালিক নুরুল ইসলামের ছোট ছেলে প্রিতমের সঙ্গে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল কলেজছাত্র শুভর। মহল্লার বড় ভাই হওয়ার সুবাদে অবাধে তার যাতায়াত ছিল প্রিতমদের বাড়িতে। আসা-যাওয়ার মধ্যে কলেজছাত্রীকে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসতে শুরু করে সে। একতরফা ভালোবাসা ভালো না লাগায় সুচতুর শুভ আদাজল খেয়ে নামে ওই কলেজছাত্রীর পেছনে। প্রিতমের মাধ্যমে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলেও তাতে রাজি হয়নি কলেজছাত্রী।

এ নিয়ে তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শুভ। কলেজছাত্রীর অহঙ্কার ধুলায় মিশিয়ে দিতে তার নগ্নদৃশ্য ধারণ করার ফন্দি আঁটে। এ জন্য একদিন প্রিতমের বাড়িতে গিয়ে পুরো ঘটনাটি তাকে জানায় শুভ।

কৌতূহলী স্কুলছাত্র পাশের বাড়ির বড় ভাই'র কথায় রাজি হয়ে যায়। পরে শুভর কথায় রাজি হয়ে কলেজছাত্রীর বাথরুমের একাংশ ফুটো করার পর ভিডিও ধারণ করা যায় এমন আধুনিক একটি মোবাইলফোন ছিদ্রের মাঝখানে বসিয়ে পাশের একটি কক্ষ থেকে দু'জনে তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কিন্তু বিধি বাম। বাথরুমে তখন কলেজছাত্রী না গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন তার মা। অকস্মাৎ ছিদ্রের মধ্যে ক্যামেরা মোবাইলটি তার চোখে পড়ে। এ সময় মেয়ের কথা মাথায় রেখে কলেজছাত্রীর মা বিষয়টি প্রিতমের মা'কে জানান। কিন্তু ততক্ষণে প্রিতমের বাসা ছেড়ে পালিয়ে যায় শুভ। প্রিতমকে তার পরিবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো ঘটনাটি শুভর কারসাজিতে হয়েছে বলে পরিবারের কাছে স্বীকার করে।

এই হলো নারীর বিপদ। নারীকে কেন্দ্র করেই শয়তান তার বাজার গরম করে রাখতে চায়। একজন নারী তার ঘরেও নিরাপদ নয়! তবেই বুঝুন, নারীর পেছনে আধুনিক সভ্যতার অকল্যাণ কত ভয়ঙ্কর! সব জায়গায় নারী দায়ী নয়, কিন্তু এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে পৃথিবীতে অধিকাংশ ভালো কাজে পেছন থেকে প্রেরণা দেন নারী, তেমনি অসংখ্য অপরাধ ও অনাকাঙ্ক্ষিত কাজেও অন্তরালে থাকে নারীর প্রতি নিষিদ্ধ টানের উপস্থিতি। শয়তান এ সুযোগই গ্রহণ করে নারীকে কাজে লাগায় মানুষকে বিপথগামী করতে। আল্লাহ তাই সতর্ক করেছেন,

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾ [المائدة: ٩١]

‘শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৯১}

বইয়ের সব ঘটনার শিক্ষার শেষ কথা হলো, এমন হাজারো শিক্ষার উপাদানসমৃদ্ধ ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের সমাজের চারপাশে ঘটে চলেছে। যতদিন আমাদের মা-বোনেরা তাদের সম্মান-সতীত্ব ও নিরাপত্তার রক্ষা কবচ পর্দার গুরুত্ব না বুঝবেন, যতদিন তারা ইসলামের শালীন ও মার্জিত জীবন বেছে না নেবেন, তাদের দুর্দশা বাড়া বৈ কমবে না।